দস্যু বনহুর
১৩-১৪
দুই খন্ড একত্রে
বাংলাপিডিএফ
বন্দিনী
মায়াচক্র
রোমেনা আফাজ
রনি

ঐই সিরিজের পরবর্তী বই
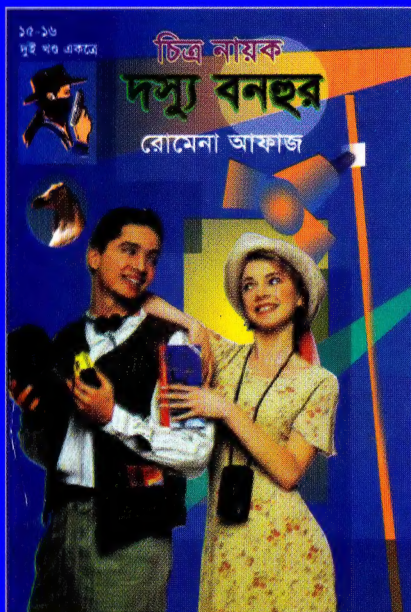
বন্দিনী-১৩
মায়াচক্র-১৪

দুই খণ্ড একত্রে

রোমেনা আফাজ

পরিবেশক

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

বাদল ব্রাদার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

নতুন সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ইং

মূল্য ঃ ৩০·০০ টাকা মাত্র।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি, কে, দাস রোড,
ঢাকা-১১০০।

আমার প্রান প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরনা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

চারদিকে সীমাহীন অথৈ জলরাশি। শুধু জল আর জল। শেষ প্রান্তে জলের সঙ্গে মিশে গেছে যেন নীল আকাশখানা। শান্ত ছেলের মতই নীরব আজ নদীবক্ষ। নেই কোনো উচ্ছলতা। মৃদু মন্দ বাতাসে দোল খেয়ে খেয়ে এগিয়ে চলেছে নূরীর নৌকা। কোলে তার অর্ধ অচেতন মনি। নূরী ব্যাকুল আঁখি মেলে তাকাচ্ছে মনির শুষ্ক মুখখানার দিকে। মাঝে মাঝে তার দৃষ্টি চলে যাচ্ছে দিক থেকে দিগন্তে। যতদূর চোখ যায় নিপুণ দৃষ্টি মেলে সন্ধান করছে তীর দেখা যায় কিনা।

আজ এক সপ্তাহের বেশি হলো তাদের এই অবস্থা হয়েছে। নৌকায় কিছু পানি আর সামান্য খাবার ছিলো তাই দিয়ে দু'তিন দিন চালিয়ে নিয়েছিলো নূরী। এ খাবারটুকুর সন্ধান নূরী জানতো না। মাঝিরা পথে খাবে বলে হয়তো এটুকু নিয়েছিলো। তাই একদিন নূরীর নজরে পড়ে গিয়েছিলো। কোনোরকমে সেই সামান্য খাবারে চালিয়ে নিয়েছিলো। কিন্তু এক সপ্তাহ বা তার বেশিদিন না খেয়ে বাঁচা তো সম্ভব নয়। প্রায় চারটি দিন ওরা সম্পূর্ণ অনাহারে। নিজের জন্য নূরীর দুঃখ নেই, মরতে হয় মরবে। কিন্তু এই অসহায় শিশু যার মুখের দিকে তাকিয়ে নূরীর দু'নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। কি করে তার এই মর্মবিদারক অবস্থা দর্শন করতে পারে সে! নূরী কায়মনে খোদাকে স্মরণ করে চলেছে।

বেলা শেষ হয়ে এলো, অস্তমিত সূর্যের শেষ রশ্মি এসে পড়লো নূরী আর মনির মুখে।

হঠাৎ নূরীর মনটা কেঁপে উঠলো, সূর্য অস্ত হবার পর নেমে আসবে জমাট অন্ধকার। পৃথিবীর আলো মুছে যাবে চোখ থেকে। কাল আবার ভোর হবে, সূর্য উঠবে। সোনালী আলোয় বসুন্ধরা ঝলমল করে উঠবে, বাতাস বইবে, দিগ হতে দিগন্তে ফুটে উঠবে কত রঙের মেলা। কিন্তু আর জাগবে না তার মনি। এই আলোর অতলে তলিয়ে যাবে একটি ছোট্ট ফুলের মত সুন্দর জীবন। আর কোনোদিন ঐ মুদিত আঁখি দু'টি মেলে তাকাবে না। আর ডাকবে না, "মাম্মা" বলে। নূরী উচ্ছসিতভাবে কেঁদে ওঠে মনি---

মনি--- ওরে তুই আর একবার চোখ মেলে দেখ্। আর একবার মাম্মা বলে ডাক্, ওরে ডাক্!

নূরীর কান্নার দোলা লাগে যেন নদীবক্ষে। হঠাৎ যেন নৌকাখানা একটু বেশি নড়ে উঠলো। চমকে উঠলো নূরী! আজ ক'দিন তার নৌকা একই-ভাবে মৃদু মন্থর গতিতে ধীরে অতি ধীরে এগিয়ে চলেছে। এতটুকু ছিলো না কোনো রকম পরিবর্তন।

এবার নৌকাখানা যেন বেশ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে বলে মনে হলো। সূর্য তখন ডুবে গেছে। নদীবক্ষে নেমে এসেছে একটা ঘোলাটে আলোছায়া।

নূরী চমকে উঠলো। বেশ দোলা লাগলো নূরীর দেহে। বুঝতে পারলো তার নৌকাখানা স্রোতের টানে দ্রুত ছুটতে শুরু করেছে। একি, কোথাও নীচু দিকে চললো নাকি তাদের নৌকা? ভয় হলো নূরীর মনে। কিন্তু পরক্ষণেই বুকে সাহস এলো তার। মৃত্যু যখন অনিবার্য তখন ভয় পেয়ে কি লাভ— মরতে তো একদিন হবেই।

নৌকাখানা এবার বেশ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। মাঝে মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছিলো, আবার ছুটছিলো আপন গতিতে। বেলা ডুবে গেছে। নৌকার ভেতর জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। নূরী মনির মুখখানা আর দেখতে পাচ্ছে না। মনিকে বুকে চেপে ধরে রইলো নূরী। দু'চোখ বন্ধ করে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো সে।

নূরী জানে, এসব পাহাড়িয়া নদী। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড় আর পাথরখণ্ড লুকিয়ে আছে। যেভাবে তাদের নৌকা এগোচ্ছে তাতে যে কোনো পাহাড় বা উঁচু পাথরের গায়ে নৌকাখানা ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে হবে তাদের সলিল সমাধি।

নূরীর মনে শেষ বারের মত বনহুরের মুখখানা ভেসে উঠলো। সেই সুন্দর দীপ্ত দু'টি চোখ। নূরী অন্ধকারে তার হুরের স্মরণ করে এত বিপদেও তৃপ্তি অনুভব করলো, পেলো অনাবিল এক আনন্দ। এ জীবন যৌবন সবই যে হুরের— এই নদীবক্ষেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে তার হুর? সেও করবে। তারপর মিলিত হবে ওরা দু'জন নির্মল জলের তলায়।

স্থিরভাবে বসে আছে নূরী।

নৌকা স্রোতের টানে তীরবেগে ছুটে চলেছে।

কখন যে নূরী নৌকায় ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার খেয়াল নেই। আজ ক'দিন উপবাসী, তারপর সব সময় কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত / শ্রান্ত হয়ে নৌকার গায়ে ঢলে পড়েছে সে।

ঘুমিয়ে রয়েছে নূরী---

হঠাৎ নূরীর ঘুম ভেঙ্গে গেলো।

ভোরের মৃদু বাতাসে দেহটা শীতল হয়ে এসেছে। এমন সময় নূরীর কানে এসে পৌঁছলো পাখীর কলরব! তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে দৃষ্টি মেললো সে! সঙ্গে সঙ্গে দু'নয়ন তার জুড়িয়ে গেলো। নৌকার ছৈয়ের বাইরে সবুজ বৃক্ষলতা, আলোছায়াভরা প্রকৃতি। পাখীরা ডালে বসে কিচমিচ করছে : কেউ বা উড়ে বেড়াচ্ছে মুক্ত আকাশে।

নূরী প্রাণভরে নিশ্বাস নিলো! ভাল করে লক্ষ্য করতেই দেখলো তাদের নৌকাখানা একটা নালার মত জায়গায় আটকে আছে। দূ'পাশে দু'খানা পাথরে চাপে তাদের নৌকা আর এগুতে পারেনি। একটা জলপ্রপাতের শব্দ কানে এলো নূরীর। নূরী মনিকে কোলে নিয়ে ছৈয়ের বাইরে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আঁতকে উঠলো সে। পাথরখন্ডের হাত কয়েক দুরেই প্রায় দু'শ ফিট গভীর খাদ। সেই খাদে জলধারা সশব্দে গিয়ে আছড়ে পড়ছে। ভাগ্যিস তাদের নৌকাখানা দু'পাশের দু'টো পাথরখন্ডের সঙ্গে আটকে পড়েছিলো, তাই এতক্ষণও বেঁচে আছে তারা নইলে দিনের সূর্যের আলো দেখার ভাগ্য আর তাদের হতো না। নূরী দু'হাত তুলে খোদার নিকটে শুকরিয়া আদায় করলো।

না,মনিও বেঁচে আছে, ক্ষুধায় একেবারে কাতর হয়ে পড়লেও এখনও প্রাণ আছে তার দেহে।

নূরী নৌকা থেকে ধীরে ধীরে নেমে দাঁড়ালো। অতি সাবধানে নামলো সে, হঠাৎ নৌকাখানা যদি খুলে যায় তাহলে আর তাদের রক্ষা থাকবে না! নূরী নেমে দাঁড়ালো তীরে। ধার দিয়েই নির্মল স্বচ্ছ জলধারা বয়ে যাচ্ছে। সে আর তৃষ্ণা ধরে রাখতে পারলো না। মনিকে বুকে চেপে উবু হয়ে পানি পান করলো। না, এ পানি অতি সুস্বাদু, লবণাক্ত নয়। নূরী মনির মুখে আঁজলা দিয়ে একটু একটু করে পানি দিতে লাগলো। মনির ঠোঁটে পানির ছোঁয়া লাগতেই ঠোঁট দু'খানা ধীরে নড়ে উঠলো। একটু পানি খেলো মনি। নূরীব মনে একটা ক্ষীণ আশা দেখা দিলো, হয়তো মনি বাঁচলেও বাঁচতে পারে!

এক সময় মনি চোখ মেলে তাকালো।

আশায় আনন্দে নূরীর মনে দোলা জাগলো, মনি তাহলে এ যাত্রা বেঁচে গেলো। কিন্তু সামান্য পানি খাইয়ে কতক্ষণ বাঁচাতে পারবে নূরী এই ছোট শিশুটিকে।

কোনো আশ্রয়ের আশায় নূরী মনিকে বুকে করে এগিয়ে চললো।

নূরী যতই এগোয় ততই অবাক হয় সে। বন হলেও গভীর নয়— সুন্দর পরিষ্কার বন।আগাছা বা ঐ ধরনের গাছ-গাছড়া নেই। বেশ বড় বড় আর সুন্দর সুন্দর ঝাউগাছ জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে নাম না জানা অনেক রকম ফুল গাছ। এক মধুর স্নিগ্ধ সুরভি নূরীর মনকে প্রফুল্ল করে তুললো।

আরও কিছুটা এগুতেই নূরী দেখলো সুন্দর পরিস্কার একটা জায়গা, দেখে মনে হলো কোনো লোক সেখানে একটু আগে ছিলো, এই মুহূর্তে উঠে গেছে। পরিস্কার জায়গাটায় স্পষ্ট পায়ের ছাপ রয়েছে। নূরীর চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বাঁচবার আশা দোলা দিয়ে গেলো তার মনে। নূরী মনিকে কোলে নিয়ে তাকাতে লাগলো চারদিকে।

নূরী কতক্ষণ বনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু আশ্চর্য এখন পর্যন্ত একটি হিংস্র প্রাণী তাঁর নজরে পড়েনি। এমন কি একটি বানর বা শিয়াল পর্যন্তও দেখতে পায়নি সে।

নূরী অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো, মনিকে কোলে করে বসে পড়লো সেই পরিষ্কার জায়গাটিতে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো নূরীর কানে— বৎস, এদিকে এসো!

চমকে উঠলো নূরী, মনিকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

সচকিতভাবে তাকালো চারদিকে— কোথা থেকে ভেসে এলো এ কণ্ঠস্বর, কে তাকে ডাকলো কি তার উদ্দেশ্য! নূরীর চোখে মুখে ফুটে উঠলো ভীতি ভাব। কই, কোথাও তো জনমানব দেখা যাচ্ছে না বা কোথাও কোনো ঘর বা কুটিরও নেই।

নূরী যখন ভয়বিহ্বলভাবে তাকাচ্ছে এদিকে ওদিকে তখন পুনরায় সেই কণ্ঠ- ভয় নেই বৎস। পূর্ব দিকে সোজা চলে এসো।

নূরী ভয়চকিত হরিণীর মত কম্পিত পদক্ষেপে এগুলো, কোলে তার মনি।

ধীরে ধীরে এগুচ্ছে নূরী।

চারদিকে বন, কিন্তু অন্ধকার নয়!

সব পরিস্কার, স্বচ্ছ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে নূরী চারদিকে। ভয় ও আতঙ্কে ধকধক্ করছে তার বুক।

গাছের ওপরে একটা পাখী পাখা ঝাপটে উড়ে গেলো।

চমকে উঠলো নূরী। মনিকে বুকে চেপে ধরলো জোরে। হঠাৎ নূরীর দৃষ্টি চলে গেলো সোজা পূর্ব দিকের একটি বৃক্ষমূলে। একি, বিস্ময়ে আরষ্ট হলো সে। অদূরে একটি বট বৃক্ষতলে জটাজুটধারী ভস্মমাখা এক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। দাঁড়ি-গোফ আর মাথার জটাজুটে তাকে কিম্ভুত কিমাকার দেখাচ্ছে।

নূরী ভীত চোখে তাকিয়ে আছে, আর এক পাও এগুতে পারছে না সে।

পুনরায় সন্ন্যাসী গম্ভীর গলায় বললো—ভয় নেই, এসো।

নূরী এবার পা বাড়ালো, কিন্তু মনের মধ্যে ঝড় বইছে। ভয় হচ্ছে সন্ন্যাসীটা নরখাদক নয় তো?

নূরী নিকটে আসতেই সন্ন্যাসী হাত তুলে বললো- বসো।

নূরী তখনও সন্ন্যাসীর নিকট হতে প্রায় দশ হাত দূরে রয়েছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো নূরী, বসে পড়লো সেখানে। সন্ন্যাসীর চেহারা তার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে চলেছে। নূরীর মত সাহসী মেয়েও ভয়ে ঘেমে উঠতে লাগলো। সন্ন্যাসীর দেহটা ঠিক পাথর বা ঐ ধরনের শক্ত কিছুর তৈরি বলে মনে হলো, এ যেন মানুষের দেহ নয়। মাথায় জটা মূলোর মত মোটা, আর লম্বায় প্রায় তিন হাতের মত, মাটিতে স্তূপাকার হয়ে রয়েছে। দাঁড়ি আর গোঁফেও জট ধরেছে। দাড়িগোঁফও দেড় দু'হাত লম্বা। ভুরুগুলো একে বারে সাদা ধব্ধবে্ হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য সন্ন্যাসীর চোখ দুটো ঠিক কাচের মত স্বচ্ছ বলে মনে হলো। বাঘের চোখের মত যেন জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। কি তীব্র সে চাহনি! নূরী বসে পড়ে মনিকে বুকে আঁকড়ে ধরলো। এবার বুঝি আর তাদের রক্ষা নেই। নরখাদক সন্ন্যাসী তার আর মনির রক্ত শুষে নেবে।

হঠাৎ সন্ন্যাসী বিকট শব্দে হেসে উঠলো- হাঃ হাঃ হাঃ---

মনি সে হাসির শব্দে নূরীর বুকে মুখ লুকালো।

শিউরে উঠলো নূরী। দু'চোখে ফুটে উঠলো রাজ্যের ভয় আর ভীতি। সন্ন্যাসী বললো—বৎস, ভয়ের কোনো কারণ নেই। জানি তুমি নিঃসহায়, নইলে এতক্ষণ তোমাকে আমি ভস্ম করে দিতাম।

নূরী অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তাকালো সন্ন্যাসীর দিকে।

সন্ন্যাসীর মুখমন্ডল যদিও দাঁড়ি গোঁফ আর জটাজুটে আচ্ছাদিত তবু সে মুখে একটা প্রসন্নতার আভাস ফুটে উঠেছে। নূরী কিছুটা আশ্বস্ত হলো।

সন্ন্যাসী পুনরায় বললো— নৌকায় তুমি যখন ভেসে চলেছিলে যোগ বলে আমি তা জানতে পেরেছিলাম। এক সপ্তাহকাল না খেয়ে মানুষ কোনোদিন বাঁচতে পারে না, আমিই তোমাকে আর তোমার ঐ পালিত সন্তানকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছি। দয়াময়ের নিকট আমি তোমাদের জীবন ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছি।

স্তম্ভিত নূরী হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে। একি, তার সব কথা যে বলে দিচ্ছে সন্ন্যাসী! সত্যই যা ঘটেছে তাই বলছে। কি করে জানলো এসব কথা সে!

নূরী যখন এসব ভাবছে তখন সন্ন্যাসী হাসলো, বললো— আমি সব জানতে পারি। একশ বছর আমি জল গ্রহণ না করে তপস্যা করে সর্বশক্তি যোগবল লাভ করেছি! তোমার এবং তোমার পালিত সন্তানের নামও অবগত আছি। তোমরা ক্ষুধায় এখন অত্যন্ত কাতর। যাও দক্ষিণে, তোমাদের খাবার প্রস্তুত রয়েছে।

নূরী চিত্রাপিতের ন্যায় উঠে দাঁড়ালো।

মনিকে কোলে করে এগুলো দক্ষিণ দিকে।

কিছুদূর এগুতেই নূরী লক্ষ্য করলো, সম্মুখে সুন্দর একটা কক্ষ। বিস্ময়ে অবাক হলো নূরী, একটু পূর্বেও এখানে কোনো কক্ষ ছিলো না।

নূরী ভয়চকিতভাবে পা বাড়ালো কক্ষের দিকে।

কক্ষের সামনে উপস্থিত হতেই দরজা মুক্ত হয়ে গেলো। নূরী মনিকে নিয়ে থমকে দাঁড়ালো, কক্ষে প্রবেশ করবে কিনা ভাবছে।

এমন সময় সেই কণ্ঠস্বর—ভয় নেই বৎস, প্রবেশ করো। নূরী ক্ষুধায় এত কাতর হয়ে পড়েছিলো যে, ভয় তার বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না বা চিন্তা করবার সময় হলো না।

কক্ষে প্রবেশ করলো নূরী।

কক্ষে প্রবেশ করতেই নানাবিধ খাদ্য সম্ভার নজরে পড়লো তার। কক্ষের মেঝেতে থালায় সাজানো থরে থরে নানা রকম ফলমূল আর বাটিভরা দুধ।

নূরী মুহূর্ত বিলম্ব করতে পারলো না, মনিকে নিয়ে বসে পড়লো খাবারের পাশে।

বাটি থেকে খানিকটা দুধ ছোট একটা গেলাসে ঢেলে মনির মুখে ধরলো।

মনি দুধটুকু ধীরে অতি ধীরে খেয়ে ফেললো।

নূরী ফলমূল আর দুধ খেয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

পেট পুরে আজ খেলো নূরী। মনি বেশী খেলো না, তবু যা খেলো তাতেই সে সুস্থ হয়ে উঠলো।

সেই কক্ষের মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়লো নূরী।

ঘুম যখন ভাঙলো নূরী দেখলো সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সবল সুস্থ হয়ে উঠেছে। মনিও যেন পূর্বের মত সুস্থ চেহারা আর হাসি খুশীতে ভরে উঠেছে, ফিক্ ফিক্ করে হাসছে সে।

নূরী জেগে উঠতেই মনি নূরীর গলা জড়িয়ে ধরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বললো— মাম্মা, আমলা কোথায় এসেছি?

নূরী হেসে বললো— দাদুর ওখানে।

একটা হাসির শব্দ হলো তার কানের কাছে—হাঁ বৎস, ঠিক বলেছো।

নূরী আর মনি চমকে তাকালো, কিন্তু কেউ কোথাও নেই। নূরী এবার মনিকে নিয়ে বেরিয়ে এলো, ঘরের বাইরে এসে সোজা চললো সন্ন্যাসীর নিকটে।

নূরী অবাক হয়ে দেখলো— সন্ন্যাসীকে সে তখন যে ভাবে যে স্থানে বসে থাকতে দেখেছে সে, ঠিক সেইভাবে সেই স্থানে বসেই আছে। আশ্চর্য, একচুল এদিক সেদিক হয়নি।

অবাক হয়ে নূরী যখন বিস্ময় বোধ করছে তখন সন্ন্যাসী হেসে বললো— আশ্চর্য হবার কিছু নেই বৎস! তুমি আজ কয়েক দন্ড পূর্বে আমাকে এভাবে এখানে দেখে অবাক হচ্ছো, কিন্তু জানো না আমি এই বটবৃক্ষ তলে আজ একশ বছর পূর্বে এক সন্ধ্যায় বসেছিলাম।

নূরী অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো— একশ' বছর পূর্বে!

হাঁ বৎস। সরে এসো, লক্ষ্য করে দেখো আমার দেহে আর মাংসপিণ্ড নেই। বটবৃক্ষের শিকড় এবং মাটি জমে জমাট হয়ে গেছে আমার দেহটা। কিন্তু আমি এখনও জীবিত আছি।

নূরী হঠাৎ বলে উঠলো— বাবা, তুমি আহার-নিদ্রা করোনা?

সন্ন্যাসীর সেই ভারী কণ্ঠস্বর— না, আহার-নিদ্রার আমার কোনো প্রয়োজন হয় না। আমি যখন যা ভাবি তখন সেই অভাব পূরণ হয়ে যায়। যখন ক্ষুধা অনুভব করি তখন যা খাবার আমার খেতে ইচ্ছা করে সেই

খাবার দ্বারা আমার উদর পূর্ণ হয়। নিদ্রা অনুভব করলে, জেগেই আমি নিদ্রিত হই, কোনো অসুবিধা আমার হয় না।

বাবা!

বৎস, জানি তুমি বড় ব্যথিত, বড় নিঃসঙ্গ।

হ্যাঁ বাবা!

বৎস, আমার আশ্রয়ে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। শুধু তুমি পশ্চিমে ভুলেও কোনোদিন যাবে না।

আমি যাবো না বাবা।

মনিকেও তুমি সাবধানে রাখবে, সেও যেন কোনোদিন ওদিকে না যায়। একটা কথা জেনে রাখো বৎস, পশ্চিমে আমার কোনো যোগবল খাটে না।

আচ্ছা বাবা।

❑

নূরী আর মনির এখন কোনো কষ্ট নেই।

সুন্দর একটা কুটিরে তারা বাস করে। পাশের ঝর্ণায় স্নান করে। যখন যা খাবার ইচ্ছা হয় তাই খেতে পায়।

কিন্তু তবু সর্বদা নূরী আনমনা হয়ে থাকে, বনহুরের কথা স্মরণ করে সে সর্বক্ষণ চোখের পানি ফেলে। সময় সময় ভাবে—বলবে সে সন্ন্যাসী বাবার কাছে, কোন্ অতলে হারিয়ে গেছে তার হুর। কিন্তু এ কথা সে বলতে পারে না কিছুতেই। এখনও জানে নূরী, তার হুর মরেনি, মরতে পারে না। কিন্তু সন্ন্যাসী বাবা যদি বলে তার মৃত্যু হয়েছে তখন কি উপায় হবে। সহ্য করতে পারবে কি সে ঐ কথা! তার হুর এই পৃথিবীর বুকে বেঁচে আছে, এই আশা নিয়ে নূরীও বেঁচে থাকবে। অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকবে—প্রতীক্ষা করবে সে হুরের।

দিন যায়, মাস আসে।

দিনে দিনে গড়িয়ে যায় একটি বছর।

মনি এখন বেশ ভালভাবে হাঁটতে শিখেছে। দীপ্ত সুন্দর ফুলের কুঁড়ির মত অর্ধ ফুটন্ত চেহারা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল, ঘাড়ের ওপর ঝুলে পড়েছে।

গভীর নীল দু'টি চোখে মনোমুগ্ধকর চাহনি। ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দে অস্ফূট ধ্বনি করে, সারাদিন খুটখুট করে হেঁটে বেড়ায়।

নূরীর ওকে নিয়ে আশঙ্কার শেষ নেই, না জানি কখন কোন দিকে চলে যাবে, কোনো হিংস্র জানোয়ার কখন ঘাড় মটকে খেয়ে ফেলবে কে জানে।

নূরী মনিকে নিয়ে যতই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে সন্ন্যাসী বাবা সান্ত্বনা দেন– ভয় নেই বৎস, এ বনে আমার সীমানায় কোনো পাপাচারী প্রবেশে সক্ষম হবে না। কিন্তু সাবধান, পশ্চিমে যেন তোমার মনি না যায়।

❑

সিন্ধুর মহারাজ নারায়ণ দেবের বিধবা কন্যা হীরাবাঈকে বিয়ে দিতে বাধ্য করেছিলো দস্যু বনহুর। হীরা এ বিয়েতে প্রথমে রাজী হয়নি, সে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলো বনহুরকে। ওকে ছাড়া সে বাঁচতে পারবেনা এ কথাও জানিয়ে দিলে ছিলো তাকে। কিন্তু বনহুর ধরা দেবার পাত্র নয়।

হীরা বনহুরকে নিয়ে স্বপ্নসৌধ রচনা করেছিলো। সব সময় ওকে নিয়ে মেতে থাকতো, বনহুর যদিও হীরা আর তার সখীদের মধ্যে নিজকে ছেড়ে দিয়েছিলো, কিন্তু নিজকে সে সংযত রাখতো অতি সাবধানে।

পুরুষ মন মাঝে মাঝে বিচলিত হতো। হীরার সান্নিধ্য তাকে করে তুলতো চঞ্চল, একটা অনুভূতি নাড়া দিয়ে যেতো বনহুরের মনে—যখন হীরাবাঈ নিভৃতে এসে বনহুরের বুকে মাথা রাখতো গভীর আবেগে জানাতো—আমি তোমাকে ভালবাসি বনহুর!

বনহুর হীরার কথায় মৃদু হাসতো, জবাব দিতো না কিছু। নিজকে সংযত রাখতো দৃঢ়চিত্তে।

হীরা তার সুকোমল বাহু দু'টি বেষ্টন দিয়ে ধরতো বনহুরের গলা—আমি তোমাকে কোনোদিন ছেড়ে দেবো না!

বনহুরের চোখে তখন ভাসতো মনিরার মুখখানা। না জানি তার এই বহুদিনের অদর্শনে মনিরা ও তার মা কত চিন্তিত ও মর্মাহত হয়ে পড়েছেন!

আরও মনে পড়তো নূরী আর মনির কথা। কোথায় তারা, বেঁচে আছে না মরে গেছে তাই বা কে জানে। আনমনা হয়ে যেতো বনহুর।

হীরা বনহুরের গম্ভীর ভাবাপন্ন ভাব লক্ষ্য করে বিমর্ষ হতো। ব্যথায় মনটা তার গুমরে কেঁদে উঠতো, অভিমান করে চলে যেতো সে বনহুরের কাছ থেকে!

সখীরা হীরার বিষণ্ন ভাব লক্ষ্য করে চিন্তিত হতো, ব্যস্তও হতো তারা। হীরাকে নানা প্রশ্ন করতো।

একদিন হীরাবাঈ মুখ গম্ভীর করে বসেছিলো, সখীরা প্রমাদ গুণলো। সবাই ঘিরে ধরে সখীর মনোভাব প্রসন্ন করার চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু হীরার মুখোভাব কিছুতেই সচ্ছ হলো না বরং অশ্রু গাড়িয়ে পড়লো তার দু'গণ্ড বেয়ে।

সখীরা উদ্বিগ্ন হলো, নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু কি ঘটেছে ভেবে পায় না তারা।

সখীরা গিয়ে ধরে বসলো বনহুরকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললো।

হেসে বললো বনহুর—তোমাদের হীরা বিয়ে করতে চায়।

পারুল সবার হয়ে বললো—তা কি করে সম্ভব, সে যে বিধবা!

কিন্তু বিধবার বিয়ে হয়।

অসম্ভব!

তাহলে হীরাকে আমার সঙ্গে মিশতে দাও কেন?

বন্ধু হিসাবে।

হীরা কি তাতেই খুশী?

না হয়ে উপায় নেই। সে জানে হিন্দু বিধবার বিয়ে হতে পারে না।

তাহলে আজ তোমাদের সখী হীরা অমন রাগ বা অভিমান করতো না।

সত্যি তাহলে----

হাঁ, হীরা শুধু ভালবাসাই চায় না, তার জীবনটা সার্থক করে তুলতে চায়, স্বামী –সন্তান সংসার নিয়ে সুখী হতে চায়।

পারুলের দু'চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ছে, বললো সে—মহারাজ যদি একথা জানতে পারেন?

বনহুর শান্ত গলায় বললো—মহারাজ রাজী হয়েছেন।

এ আপনি কি বলছেন?

হাঁ পারুল, হীরার আবার বিয়ে হবে এবং অতি শীঘ্রই হবে।

পারুলের দু'চোখে আনন্দ ঝড়ে পড়ে। ছুটে গেলো সখীদের নিয়ে হীরার পাশে। বললো পারুল—সখী, এবার বুঝতে পেরেছি তোমার মনের কথা। জানি তোমার কোথায় এতো ব্যথা। হুঁ--- পারুল হীরার গালে মৃদু আঘাত করে।

হীরা সখীদের খুশীভরা ভাব দেখে কিছুটা প্রসন্ন হয়, বলে—যা, তোরা বড্ড দুষ্ট!

পারুল জড়িয়ে ধরে হীরাকে—এবার সব দুঃখ সব ব্যথা দূর হবে সখী। বন্ধুকে পাবি এবার অতি আপন করে।

হীরা অবাক হয়ে বলে— সত্যি?

সত্যি নয় তো মিথ্যা বলছি!

কে বললো এ কথা তোকে পারুল?

তোর বন্ধু।

ও বলেছে?

সেদিন হীরা ভেবেছিলো বনহুরকেই সে স্বামীরূপে পাবে। আশায় আনন্দে নেচে উঠেছিলো তার মন। অফুরন্ত খুশী নিয়ে প্রতীক্ষা করছিলো সেই দিনটির যেদিন বন্ধুকে সে একান্ত আপনার করে পাবে।

হীরা যতই বনহুরের কথা ভেবে আনন্দ উপভোগ করছিলো বনহুর ততই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিলো। গোপনে সে পাশের রাজ্যের অবিবাহিত রাজার সঙ্গে হীরার বিয়ের সব আয়োজন ঠিক করে ফেললো।

একদিন বিয়ের শুভ লগ্ন এগিয়ে এলো।

হীরার আনন্দ আর ধরে না।

হীরা যতই বনহুরের সঙ্গ কামনা করে, বনহুর ততই নিজকে সরিয়ে রাখে ওর কাছ থেকে। গোপনে পালিয়ে থাকে এদিকে সেদিকে।

একদিন বনহুর পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটে বসে নিজের কাজের কথা ভাবছিলো, হীরা চুপি চুপি গিয়ে বনহুরের চোখ দুটো টিপে ধরলো।

বনহুর হেসে বললো—হীরা!

হীরার দু'চোখে আনন্দের দ্যুতি খেলে গেলো। বসে পড়লো বনহুরের পাশে—কি ভাবছো?

তোমার বিয়ের কথা।

লজ্জায় হীরার মুখ লাল হয়ে ওঠে, বলে— তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

খুব!

সত্যি?

সত্যি।

এরপর একদিন সত্যিই হীরার বিয়ের দিন এগিয়ে এলো।

মহারাজ নারায়ণ দেব কন্যার বিয়ের সব আয়োজন করলেন। যদিও প্রজাগণ এ বিয়েতে সন্তুষ্ট ছিলো না তবু মহারাজের মতের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে পারলে না।

একমাত্র রাজগুরু বেঁকে বসলেন, মহারাজকে জানালেন— বিধবা কন্যার বিয়ে দিলে অমঙ্গল হবে।

রাজগুরুর আদেশ অমান্য করা কারও সাধ্য নয়। মহারাজ নারায়ণ দেব চোখে সর্ষে ফুল দেখলেন। এটা কি তারই ইচ্ছা, দস্যু বনহুর তাঁকে বাধ্য করেছে—নইলে মৃত্যু তাঁর অনিবার্য। মহারাজের হৃদয়ে ঝড়ের তান্ডব শুরু হলো।

একদিকে দস্যু বনহুরের তীক্ষ্ণধার ছোরা আর একদিকে রাজগুরুর অমঙ্গল বাণী। নারায়ণ দেব সমস্যায় পড়লেন। এদিকে বিয়ের সব আয়োজন সমাধা হয়েছে।

পাত্র কে এবং কেমন দেখতে কিছুই জানেন না মহারাজ, এসব দায়িত্ব নিয়েছে বনহুর নিজে।

মহারাজকে বলেছে সে— আপনার কন্যার মঙ্গল কামনাই আমার লক্ষ্য। আপনার জামাতা কুলীন ব্রাহ্মণ এবং সে অন্য এক রাজ্যের রাজা। দেখতে শুনতে বেশ। হীরার সাথে মানাবে ভাল। বিয়ের দিন বর আসবে বিয়ে হবে। তারপর শুভ দৃষ্টির সময় বরের মুখের আবরণ উন্মোচন করা হবে।

বিয়ের দিন।

হীরা বাঈকে ঘিরে সখীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে।

নানা জনে নান রকম আলাপ ঠাট্টা করছে তার সঙ্গে। হীরার মনে খুশীর উৎস বয়ে চলেছে। আজ সে বনহুরকে নিজের করে পাবে। আর কোনদিন সে চলে যাবে না তাকে ছেড়ে।

বিয়ে হয়ে গেলো।

এবার শুভ দৃষ্টি।

বরের মুখ এতক্ষণ একটা সুন্দর চাদরে ঢাকা ছিলো। কতগুলো ফুলের মালাও ছিলো ছোট চাদারের সংগে আঁটা। তবে বরকে ভালই লাগছিলো, যদিও তার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না।

শুভ দৃষ্টির সময় চমকে উঠলো হীরা, এ তো তার বনহুর নয়। কিছু বলতে পারলো না, একটা অস্ফুট শব্দ করে ঢলে পড়লো সে। কিন্তু আর কোনো উপায় নেই। অগ্নিস্বাক্ষী রেখে বিয়ে তাদের হয়ে গেছে।

হীরা যখন স্বামীর সঙ্গে বাসর কক্ষে প্রবেশ করলো তখন বনহুর একটা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে দ্রুত বেগে ছুটে চলেছে রাজ্যের শেষ প্রান্তে।

এরপর আর কোনদিন হীরা বা তার সখীরা বনহুরকে দেখতে পেলো না।

❑

অজানার পথে ছুটে চলেছে বনহুর। কোথায় চলেছে তা সে নিজেই জানে না। দিকহারা, দিশেহারা উদভ্রান্ত পথিকের মত যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে অশ্ব চালনা করছে।

দিন যায়, রাত আসে---- আবার দিন হয়! আবার রাত হয়! বনহুরের চলার বিরাম নেই।

একদিন পথের শেষে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো। আশে পাশে কোথাও কোনো লোকালয় নেই। বনহুর আর এগুলো সমীচীন মনে করলো না। একটা গাছের সংগে ঘোড়াটা বেঁধে গাছটার নীচে শুয়ে পড়লো। পথ চলার ক্লান্তি আর অবসাদে বনহুরের শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো, অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়লো সে!

একটা ধস্তাধস্তির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেলো বনহুরের। তাড়াতাড়ি উঠে বসলো, তাকালো সামনের দিকে! অন্ধকারে কিছুই নজরে পড়ছে না—শুধু তার ঘোড়াটা যেখানে বাঁধা ছিলো সেইখানে প্রচন্ড শব্দ হচ্ছে।

বনহুর কিছু বুঝতে না পেরে অগ্রসর হলো।

একটু এগিয়েছে অমনি পায়ের সংগে বিরাট গাছের গুঁড়ির মত কিছু লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। সর্বনাশ, কি ঠান্ডা সেই জিনিসটা । বনহুর

ভয় পাবার পাত্র নয়, চট করে উঠে দাঁড়ালো। অন্ধকারে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মুহূর্তে তার মুখমন্ডল বিবর্ণ হলো, বিস্ময়ে আড়ষ্ট হলো সে।

বনহুরের মত নির্বীক দস্যুও বিচলিত হলো।

বিরাট একটা অজগর তার অশ্বটার অর্ধেক গিলে ফেলেছে আর অর্ধেকটা এখনও ঝুলছে অজগরের মুখ গহ্বরে। ঘোড়াটার সামনের ভাগ অজগরের মুখের ভেতরে প্রবেশ করেছে, আর পেছনের অংশ এখনও ছটফট করছে। বনহুর নিরস্ত্র নয়, তার সংগে একটা রাইফেল রয়েছে। এটা বনহুর মহারাজ নাবায়ণ দেবের অস্ত্রাগার থেকে নিয়ে এসেছিলো। বনহুর রাইফেল বাগিয়ে ধরলো, কিন্তু গুলী ছুঁড়বার পূর্বে মনে হলো ওকে মেরে কোনো ফল হবে না। ঘোড়াটা প্রাণ হারিয়েছে, আর তাকে ফিরে পাওয়া যাবে না। রাইফেল নীচু করে নিলো বনহুর।

কিন্তু এখানে আর বিলম্ব করা মোটেই উচিত নয়। বনহুর রাতের অন্ধকারেই দ্রুত চলতে লাগলো।

অশ্বটাকে হারিয়ে বনহুর বিপদে পড়লো। এই নির্জন নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে কোন দিকে কোথায় যাবে। কোথায় কোন বিপদ ওত পেতে আছে কে জানে।

বেশী দূর না এগিয়ে বনহুর সামনে একটা বৃক্ষ দেখতে পেয়ে তাতেই চড়ে বসলো।

সেদিন রাতে আর ঘুম হলো না।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই বনহুর নেমে পড়লো। ঘোড়াটা না থাকায় বড় অসুবিদা হয়ে পড়লো তার। পায়ে হোঁটে কতদূর যাবে, কোথায় যাবে সে?

তবু চলতে লাগলো, দক্ষিণ হাতে গুলীভরা রাইফেল। এটাই এখন তার সম্বল।

বনবাদাড়, পথ–ঘাট মাঠ পেরিয়ে এগিয়ে চললো বনহুর। গোটা দিন চলার পর দূরে অনেক দূরে দেখা গেলো বড়বড় দালানকোঠা আর ইমারত।

বনহুর দ্রুত পা চালালো।

ক্ষুধায় পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলো সে। তবু এগুচ্ছে যেমন করে হোক তাকে শহরে পৌঁছতেই হবে।

প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি, বনহুর শহরের সিংহদ্বারে এসে পৌঁছলো। একটা সরাইখানা দেখতে পেয়ে সেখানে প্রবেশ করলো।

বনহুরের দেহের পোশাক পরিচ্ছদ রাজ রাজার মতই ছিলো। হীরার ইচ্ছায় তাকে এ পোশাক পরতে হয়েছিলো। একটা মূল্যবান পাগড়ীও ছিলো তার মাথায়। পায়ে মূল্যবান নাগরা।

বনহুরকে দেখে সরাইখানার মালিক সসম্মানে অভ্যর্থনা জানালো।

বনহুর একটা চেয়ারে গিয়ে বসলো। তাকিয়ে দেখতে লাগলো সরাইখানার চারদিকে। প্রত্যেকটা টেবিলের পাশে জটলা পাকিয়ে লোকজন বসে আছে। মাঝে মাঝে দু'চারজন নারীও রয়েছে।

সব টেবিলেই মদের বোতল আর নানা রকম ফলমূল সাজানো। বনহুর সরাইখানায় প্রবেশ করতেই কক্ষস্থ সবাই একবার তার দিকে তাকিয়ে দেখলো। অবশ্য বনহুরকে এ সরাইখানায় তারা এই প্রথম দেখলো। তাই আশ্চর্য হলো অনেকেই।

কয়েকটা যুবতী বসেছিলো, তারা বনহুরকে দেখে নিজেরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলো। সবাই বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে।

একটি অর্ধ উলঙ্গ নারী নাচতে শুরু করলো।

একপাশে বাদ্যকরগণ দাঁড়িয়ে বাজনা বাজাচ্ছে।

বনহুরের সামনে এক বোতল মদ আর কিছু মাংস ও ফলমূল এনে সাজিয়ে রাখলো।

বনহুর অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলো, খেতে শুরু করলো।

কিন্তু যখন স্মরণ হলো, তার পকেট তো শূন্য, তখন ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবতে লাগলো। খেয়েছে এখন পয়সা দিতে হবে তো?

পয়সার চিন্তায় বেশ অশ্বস্তি বোধ করলো। সে দস্যু হতে পারে, লুটতরাজ করে নিতে পারে, বিপাকে পড়লে খুন করতেও তার বাধে না। কিন্তু সে তো পয়সা ছাড়া খেতে পারে না। বনহুর অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে নাচনেওয়ালী নাচতে নাচতে তার পাশে এসে দাঁড়ালো, অদ্ভূত ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়লো বনহুরের দিকে।

বনহুর তাকালো, দেখলো নাচনেওয়ালীর গলায় ঝকঝক করছে একছড়া হার। মূল্যবান হার ছড়ার দিকে তাকিয়ে বনহুর উঠে দাঁড়ালো। হাত বাড়ালো নাচনেওয়ালীর দিকে।

নাচনেওয়ালী বনহুরের চেহারায় মুগ্ধ হলো। দু'হাত বাড়িয়ে বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে নাচার ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়লো।

সেই ফাঁকে অদৃশ্য হলো নর্তকীর কণ্ঠের হার।

বনহুর এসে বসলো টেবিলের পাশে।

নর্তকীর নাচ তখন শেষ হয়ে গেছে। অনেকেই বেরিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো। তাদের সংগে বনহুরও উঠে দাঁড়ালো।

সরাইখানার মালিক একপাশে গদি আঁটা সোফায় বসে আলবোলা টানছিলো।

বনহুর ভীড় ঠেলে বেরিয়ে যাবার সময় চট করে হারছড়া সরাইখানার মালিকের হাতে গুঁজে দিয়ে দ্রুত সরে পড়লো।

সরাইয়ের মালিক হারছড়া হাতে নিয়ে অবাক হয়ে দেখছে, আর ভাবছে, সামান্য ভুরিভোজনে একটা মূল্যবান হার--- ব্যাপার কি?

সরাইখানার মালিক হারছড়া হাতে নিয়ে দেখছে, এমন সময় নর্তকীর করুণ আর্তকণ্ঠ শোনা গেলো— আমার হার কি হলো! আমার হার কি হলো'?

সরাইখানার মালিক নর্তকীর দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো তার গলা শূন্য,হার নেই। সব বুঝতে পারলো এটাই নর্তকীর হার। আশ্চর্য, এ হার নতুন আগন্তুক লোকটির নিকটে কি করে গেলো এবং সে না নিয়ে তার হাতে দিয়ে গেলো কেন ভাবতে লাগলো সরাইয়ের মালিক। তারপর হারটা ফিরিয়ে দিলো সে নর্তকীর হাতে।

বনহুর পথ চলেছে। রাতের মত ক্ষুধা পূরণ হয়ে গেছে তার। এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। বহু পথ আজ সে হেঁটে এসেছে। এক রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে।

শিথিল পা দু'খানা টেনে টেনে চলছিলো বনহুর। এখনও তার সঙ্গী রাইফেলটা রয়েছে।

রাত বেড়ে আসছে।

একটা নির্জন পথ ধরে এগুচ্ছিলো বনহুর। মাঝে মাঝে দু'একটা পথিক তার পাশ কেটে চলে যাচ্ছিলো।

এখানে কেউ তাকে চেনে না, যদি কেউ জানতো এ লোক স্বাভাবিক পথিক নয়, তাহলে আঁতকে উঠতো। কিন্তু এদেশের কেউ বনহুরকে চেনেনা জানে না।

বনহুর আপন মনে এগিয়ে চলেছে।

অন্য একটা সরাইখানা পেলে উঠে পড়বে, রাতের মত একটু আশ্রয় তার চাই।

হঠাৎ বনহুরের কানে ভেসে এলো একটা নারীকণ্ঠের তীব্র করুণ আর্তনাদ— আঃ, আঃ, আঃ ----ক্রমে থেমে এলো শব্দটা।

বনহুরের জড়তা মুহূর্তে ছুটে গেলো, সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো চারদিকে।

বনহুর লক্ষ্য করলো পথের ধারে একটা বাড়ীর দোতলা থেকে এই শব্দটা এসেছে। বাড়ীটা মস্তবড়। দ্বিতলের একটা কক্ষে আলো দেখা যাচ্ছে।

বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়ালো, তাকিয়ে রইলো দোতলার বৈদ্যুতিক আলোক রশ্মির দিকে। একটা ছায়ার মত কিছু নড়ছে দেখতে পেলো সে। আর একদন্ড বিলম্ব না করে রাইফেলখানা পিঠের সঙ্গে বেঁধে বাড়ীখানার দিকে এগিয়ে গেলো সে। লক্ষ্য করে দেখলো কিভাবে ওপরে যাওয়া যায়। নিশ্চয়ই কোনো নারী বিপদে পড়েছে।

বনহুর কিছু ভাবছে ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ট্যাক্সি থামলো বাড়ীখানার সামনে।

বনহুর মুহূর্তে সরে দাঁড়ালো দেয়ালের আড়ালে।

বনহুর আড়াল থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলো।

ট্যাক্সিখানা পৌঁছতেই বাড়ীর মধ্যে সিঁড়িতে দ্রুত পদশব্দ হতে লাগলো। ভারী জুতোর শব্দ, কেউ সিঁড়ি বেয়ে দোতলা থেকে নেমে আসছে মনে হলো।

বনহুর স্তব্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

দরজা খুলে গেলো, চমকে উঠলো বনহুর। দেখতে পেলো আপাদমস্তক জমাকালো আলখেল্লায় ঢাকা একটা লোক দ্রুত গাড়ীটায় উঠে বসলো।

মাত্র দুজন লোক গাড়ীতে। একজন ড্রাইভার অন্যজন সেই অদ্ভূত আলখেল্লাধারী।

বনহুর ভাবলো, এই মুহূর্তে এদের দুজনকে কাবু করা তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়, কিন্তু এই যে একটা আর্তনাদ তারপর এদের দ্রুত পলায়ন, এর পেছনে কি রহস্য লুকিয়ে আছে কে জানে।

বনহুর লোক দু'টিকে অনুসরণ করবে না দোতলায় গিয়ে দেখবে ভাবতে লাগলো। এমন সময় গাড়ীখানা ষ্টার্ট দিয়ে চলতে শুরু করলো। বনহুর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর চাকা লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো।

চাকার হাওয়া বেরিয়ে গেলো। গাড়ী কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে থেমে পড়লো। বনহুর দ্রুত ছুটলো গাড়ীর দিকে।

লোকগুলোও সজাগ ছিলো গাড়ী থেমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নেমে পড়লো, তারপর একটা বাড়ীর আড়ালে অদৃশ্য হলো।

বনহুর গাড়ীর নিকটে পৌছে হতবাক হলো।

আলখেল্লাধারী ও গাড়ীর ড্রাইভার উভয়েই কোনো বাড়ীর অন্তঃপুরে আত্মগোপন করেছে।

ঘন বাড়ীঘর আর দালানকোঠা থাকায় শয়তানদ্বয় পালাতে সক্ষম হলো, নইলে বনহুরের হাতে তাদের রক্ষা ছিলো না।

বনহুর এবার দ্রুত ছুটে চললো সেই পূর্বের বাড়ীটার দিকে। যে বাড়ী থেকে পূর্বে একটা করুণ আর্তনাদ ভেসে এসেছিলো।

বনহুর প্রাচীর বেয়ে উপরে উঠলো, তারপর পাইপ্ বেয়ে উঠতে লাগলো। দোতলা হলেও বেশ উঁচু বাড়ীখানা। বনহুর অনেক চেষ্টায় উঠে পড়লো। তারপর রেলিং টপকে প্রবেশ করলো দোতলার বারান্দায়। সতর্কভাবে চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। গোটা বাড়ীটা নিস্তব্ধ। বনহুর আর বিলম্ব না করে কক্ষের দরজায় এসে ধাক্কা দিলো, সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেলো।

কক্ষে প্রবেশ করতেই স্তম্ভিত হতবাক হলো সে।

কক্ষের মেঝেতে লুকিয়ে পড়ে আছে একটি রক্তাক্ত যুবতী। যুবতীর বুকের রক্তে মেঝের কার্পেট লালে লাল হয়ে গেছে।

বনহুর যুবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো, একি! এ যে সেই যুবতী!

সন্ধ্যায় সরাইখানায় এই যুবতীই অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় নেচেছিলো এবং যার গলা থেকে বনহুর মূল্যবান হারছড়া গোপনে খুলে নিয়েছিলো। কিন্তু একে হত্যা করলো কে? কি কারণ রয়েছে এর হত্যার পেছনে? এতবড় বাড়ীতে যুবতী একাই বা থাকে কেন এর কি কেউ নেই?

বনহুরের মনে নানা প্রশ্নে উঁকি দিচ্ছে। নিহত যুবতীকে ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলো সে। দেখলো যুবতীর বুকে গভীর ক্ষত ছোরার আঘাতে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এখনও ক্ষত দিয়ে তাজা লাল টকটকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

বনহুরের দৃষ্টি হঠাৎ চলে গেলো যুবতীর গলায়। একটা আঁচড়ের লাল দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেখানে। যুবতীর হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ দেখে বনহুর দ্রুতহস্তে ওর হাতের মুঠি খুলে ফেললো। চমকে উঠলো বনহুর, নিহত

যুবতীর মুঠার মধ্যে দেখতে পেলো চেনের খানিকটা অংশ, একটা মূল্যবান পাথরও রয়েছে চেনের সঙ্গে। বিদ্যুতের আলোতে চেনের পাথরটা ঝকমক করে উঠলো। বনহুরের স্মরণ হলো—সন্ধ্যায় যুবতীর গলায় এই হারছড়াই সে দেখেছিলো এবং এটাই সে খুলে নিয়েছিলো। হারে অন্ততঃপক্ষে এই রকম পাঁচখানার বেশী পাথর ছিলো এও বেশ মনে আছে তার।

বনহুরের নিকটে যুবতীর হত্যা-রহস্য এবার পরিস্কার হয়ে এলো। দুঃখ হলো তার হারছড়া তখন যদি ফিরিয়ে না দিতো তাহলে আজ এই মুহূর্তে যুবতীর মৃত্যু ঘটতো না।

বনহুর যুবতীর হাতের মুঠা থেকে মালার টুকরোখানা নিয়ে দাঁড়ালো, শপথ করলো সে—এই যুবতীর হত্যাকারীকে সে খুঁজে বের করবেই, এবং নিজ হাতে এর শাস্তি তাকে দেবে।

বনহুর উঠতে যাবে—এমন সময় সিঁড়িতে দ্রুত বুটের শব্দ শোনা গেলো।

বনহুর এবার বুঝতে পারলো, কোনো লোক এই হত্যার সন্ধান পেয়েছে। এখন তারা যদি এসে তাকে এখানে এই অবস্থায় দেখে ফেলে তাহলে আর রক্ষা নেই। তাকেই যুবতীর হত্যাকারী বলে জানবে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুর একটা আলমারীর পেছনে লুকিয়ে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করলো কয়েকজন পুলিশ অফিসারসহ এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও এক যুবক। বনহুর দেখতে পেয়েই চিনতে পারলো প্রৌঢ় লোকটি অন্য কেউ নয়, সরাইখানার মালিক যাকে তখন বনহুর মালাছড়া দিয়ে এসেছিলো আর যুবকটিকেও তখন সে দেখেছিলো সরাইখানার একটি টেবিলের পাশের চেয়ারে।

পুলিশ অফিসারাগণ ও প্রৌঢ় ভদ্রলোক যুবতীর লাশের নিকটে এসে দাঁড়ালেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক বারবার রুমালে চোখ মুছতে লাগলেন। পুলিশ অফিসার একজন—বোধ হয় পুলিশ ইন্সপেক্টার হবেন, তিনি ঝুঁকে পড়ে লাশ পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলে উঠলেন—না জানি কোন দুশমন আমার কন্যা মালতীকে খুন করেছে।

বনহুর এবার বুঝতে পারলো, নিহত যুবতী সরাইখানার মালিকের কন্যা, নাম মালতী। কিছুটা অবাকও হলো বনহুর প্রৌঢ় ভদ্রলোকের রুচির পরিচয় পেয়ে। নিজ কন্যার দ্বারা এভাবে অর্থ উপার্জন ছাড়া তার কি কোনো

উপায় ছিলো না? কিন্তু সঙ্গের যুবকটি কে? যে এখনও একটি কথাও উচ্চারণ করেনি। লাশটার একপাশে দাঁড়িয়ে স্থিরচোখে তাকিয়ে আছে সে।

পুলিশ ইন্সপেক্টার লাশ পরীক্ষা শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন— আপনার কন্যার হত্যাকান্ড অত্যন্ত রহস্যজনক।

প্রৌঢ় ধরা গলায় বললেন—হাঁ স্যার, সেই রকমই মনে হচ্ছে।

ইন্সপেক্টর বললেন–আপনি এবার সব কথা আমার কাছে স্পষ্টভাবে বলুন। কারণ, আপনার বলার বিবরণে নির্ভর করবে আপনার কন্যার মৃত্যু–রহস্য উদঘাটন।

প্রৌঢ় বলল— বলুন কি জানতে চান।

ইন্সপেক্টার একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধোঁয়া ছুড়ে বললেন— আপনার কন্যা কি এ বাড়ীতে একাই থাকতো?

না। যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক–ও নীচের তলায় থাকে। আজ সে ছিলো না, সরাইখানার একটা জরুরী কাজে তাকে বাইরে পাঠিয়েছিলাম।

আপনি কোথায় থাকেন?

আমি---আমাকে সরাইখানার কাজে প্রায়ই সেখানে থাকতে হয়। আমি সরাইখানার একটি কামরায় থাকি।

আপনার কন্যা নিহত হওয়ার সংবাদ কি করে পেলেন?

এখানে একটি চাকর থাকে, সেই ছুটে গিয়ে আমাকে সংবাদ দেয়। ইরে রহমত, এদিকে আয়।

একটা জমকালো লোক কক্ষে প্রবেশ করে একপাশে দাঁড়ালো। লোকটা নিগ্রো বা কাফ্রি বলে মনে হলো।

পুলিশ ইন্সপেক্টার লোকটার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন— তুমি এ বাড়ীতে থাকো?

হাঁ। কাফ্রি লোকটা জবাব দিলো।

ইন্সপেক্টার পুনরায় প্রশ্ন করলেন—তুমি মিস মালতীর হত্যা সম্বন্ধে কি জানো বলো?

কাফ্রি খাঁটি বাংলায় বললো—আমি আজ সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কারণ----- যুবকের দিকে তাকিয়ে বললো—উনিও ছিলেন না, একা একা কি করবো। দিদিমণির খাবার সাজিয়ে রেখে শুয়ে পড়েছিলাম।

তোমার দিদিমণি কখন বাসায় ফিরে এসেছিলো জানো?

জানি। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে জেগে পড়েছিলাম। মনে করেছিলাম, দিদিমণির খাবার এবং অন্য সব কিছু তো গুছিয়ে রেখেছি, তবু যদি ডাকেন তবে উঠে পড়বো। কিন্তু তিনি আর ডাকলেন না। আমিও উঠলাম না। চুপ করে শুয়ে থেকেই শুনতে পেলাম সিঁড়িতে একসংগে দু'জন লোকের পায়ের শব্দ।

দু'জন লোকের পায়ের শব্দ?

হাঁ স্যার। আমার মনে হলো অরুণ বাবু আর মালতী দিদি এক সংগে ফিরে এলেন। কাফ্রি লোকটা যুবকটির দিকে আর একবার তাকালো।

বনহুর আড়ালে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলো, যুবকটির নাম অরুণ বাবু। আলমারীর আড়ালে আত্মগোপন করতে গিয়ে মশার কামড়ে পা দুটো জ্বালা করছে। কিন্তু উপায় নেই একটু নড়বার। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ওদের কথাবার্তা শুনছে বনহুর।

পুলিশ ইন্সপেক্টার এবার যুবকে লক্ষ্য করে বললেন—অরুণ বাবু, আপনি কি মিস মালতীর সংগে ফিরে এসেছিলেন? সত্যি কথা বলবেন।

সত্য কথাই বলবো আমি তার সংগে ফিরে আসিনি। গম্ভীর স্থির কণ্ঠস্বর অরুণ বাবুর।

তবে কে এসেছিলো মিস মালতীর সঙ্গে? প্রশ্ন করলেন ইন্সপেক্টার।

অরুণ বাবু পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো—সে কথা নিহত মালতী ছাড়া কেউ জানেনা।

হুঁ। অস্ফুট শব্দ করলেন পুলিশ ইন্সপেক্টার।

আড়ালে দাঁড়িয়ে বনহুরের ভ্রূকুঞ্চিত হলো।

এবার ইন্সেপক্টার প্রশ্ন করলেন কাফ্রি চাকরটাকে—সিঁড়িতে উঠাকালে মালতী এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির কথাবার্তা শুনতে পাওনি?

না স্যার। সিঁড়িতে তাদের কোনো কথাবার্তা শুনতে পাইনি। তবে একটু পরে দিদিমণির কক্ষে অরুণ বাবুর গলার স্বরের মত আওয়াজ পেয়েছিলাম একটু।

অরুণ বাবু বলে উঠলেন—মিথ্যে কথা! আমি কিছুক্ষণ পূর্বে আমার কাজ সেরে সরাইখানায় ফিরে মালতীর হত্যাকান্ডের কথা জানতে পারি এবং উনার সঙ্গে চলে আসি। মালিককে দেখিয়ে বললো— অরুণ বাবু।

ইন্সপেক্টার এবার কাফ্রি চাকরটাকে প্রশ্ন করলেন— তুমি মালতীর হত্যা ব্যাপারে কখন জানতে পেরেছিলে?

কাফ্রি চট করে বললো— আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ একটা আর্তনাদে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। আর্তনাদের শব্দটা দিদিমণির বলেই মনে হলো— ছুটে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে, ওপরে গিয়ে হতবাক হলাম, দেখলাম দিদিমণির রক্তাক্ত দেহ মেঝেতে পড়ে আছে।

পুলিশ ইন্সপেক্টার বললেন— তারপর?

কাফ্রি একবার সকলের অলক্ষ্যে অরুণ বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো, অরুণ বাবুও তাকিয়েছিল তার দিকে। দিষ্টি বিনিময় হতেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল সে—আমি কখন কি করবো ভেবে না পেয়ে ছুটলাম সরাইখানার দিকে।

আলমারীর আড়ালে দাঁড়ালো বনহুর, দাঁতে দাঁত পিষলো, কারণ কাফ্রির কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সে ভালোভাবে লক্ষ্য করেছে—এ বাড়ী থেকে দু'জন লোক ট্যাক্সিতে পালিয়েছে। এ ছাড়া অন্য কেউ এ বাড়ীর বাইরে যায়নি। কাফ্রি চাকরটা একেবারে মিথ্যা কথা বানিয়ে বললো।

পুলিশ ইন্সেপেক্টর বললেন— তুমি যখন সরাইখানায় গিয়ে পৌছলে, তখন সেখানে কি অরুণ বাবু ছিলেন?

না, ছিলেন না। আমি দিদিমণির হত্যাকান্ডের কথা মালিককে জানিয়ে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় অরুণ বাবু সেখানে উপস্থিত হলেন।

ইন্সপেক্টর গম্ভীরভাবে একটু ভেবে নিয়ে সরাইখানার মালিককে লক্ষ্য করে বললেন— মিঃ শর্মা, আপনি কি জানেন আপনার কন্যার সঙ্গে আর কোনো ব্যক্তির বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বা নিবিড় যোগাযোগ ছিলো?

বাসুদেব শর্মা ব্যথাকাতর কণ্ঠে বললেন— আমার কন্যা মালতীর তেমন কোনো বন্ধু-বান্ধব ছিলো না। সে সব সময় অরুণের সঙ্গেই ওঠা-বসা করতো।

আপনি খুব ভালভাবে চিন্তা করে বলুন আর কারও সঙ্গে তার মেলামেশা ছিলো কি না?

বেশ কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন বাসুদেব—ছিলো, সে হচ্ছে ধনবান মিঃ লুই এর পুত্র জন। জনকে এক সময় মালতী গভীরভাবে ভালবাসতো। জনও ভালোবাসতো মালতীকে। কিন্তু জন লন্ডনে চলে যাবার পর মালতী একমাত্র অরুণ ছাড়া আর কারও সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশতো না।

ইন্সপেক্টর বললেন—জন কি এখন লন্ডনেই অবস্থান করছে?

না, সে কিছুদিন হলো ফিরে এসেছে।

এখনও কি সে আপনার কন্যার সংগে পূর্বের ন্যায় মেলামেশা করতো?

না, লন্ডন থেকে ফিরে আসার পর সে মালতীর সঙ্গে দেখাই করতে আসেনি। মালতীই নাকি গিয়েছিলো তার সঙ্গে দেখা করতে। শুনেছি সে মালতীর সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেনি।

পুলিশ ইন্সপেক্টর মিঃ লাহিড়ী একটা শব্দ করলেন—হুঁ। তারপর বললেন—মালতী ফিরে এসে কিছু বলেছিলো আপনাকে?

হাঁ। বলেছিলো, জন নাকি কোন্ মেয়েকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে। একটু থেমে বললেন বাসুদেব— মালতী জনকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলো। সেদিন ওর ওখান থেকে ফিরে গোটা রাত কেঁদে কেঁদে কাটিয়েছিলো মা আমার। একটু থেমে বললেন পুনরায়—জনের সুন্দর চেহারাই আমার মালতীর কাল হয়েছিলো ইন্সপেক্টর।

ইন্সপেক্টার একবার সকলের অলক্ষ্যে অরুণ বাবুর মুখমন্ডল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন। তারপর লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে তখনকার মত বিদায় গ্রহণ করলেন।

ইন্সপেক্টার সংগীদের নিয়ে চলে যেতেই অরুণ বাবু বলে উঠলো—একি, ঘটে গেলো কাকাবাবু?

সরাইখানার মালিক বাসুদেব তখনও কাঁদছিলেন। একমাত্র কন্যার মৃত্যু তাঁর অন্তরে যেন শেলবিদ্ধ করেছে। বাববার তিনি রুমালে চোখ মুছছিলেন। অরুণ বাবুর কথায় তাকালেন তার দিকে, একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন–সবই জানেন সেই সর্বজ্ঞ।

কাফ্রি চাকরটা তাকালো অরুণ বাবুর দিকে, তারপর বললো—এ ঘরে বেশীক্ষণ থাকতে মন আমার চাইছে না। কেমন যেন ভয় ভয় করছে।

অরুণ বাবু বলে উঠলো— চলুন কাকাবাবু, আমারও বড় অস্বস্তি লাগছে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—চলো।

সবাই কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলো।

অরুণ বাবু চলে যাবার সময় একবার কক্ষের চারদিকে লক্ষ্য করে দেখে নিলো, তারপর নিঃশব্দে অনুসরণ করলো সরাইখানার মালিক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে।

সবাই কক্ষ ত্যাগ করতেই আলমারীর আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো বনহুর, চোখেমুখে তার একটা উন্মাদনা।

❑

কক্ষে অরুণ বাবু অস্থিরভাবে পায়চারী করছে। চোখে তার ঘুম নেই। দেয়ালঘড়িটা ঠক্ ঠক্ শব্দ করে আপন মনে নিজের গন্তব্য পথে এগিয়ে চলেছে।

অরুণ বাবুর ললাটে গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। চোখ দুটোতে কেমন জ্বালাময় চাহনি। মনের অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তার মুখোভাবে। কি যেন ভাবছে, কখনও মাথার চুল ধরে টানছে, কখনও বা অধর দংশন করছে।

এক সময় অরুণ বাবু ঘরের টেবিলের ড্রয়ার খুলে ফেললো, বের করলো সুতীক্ষ্ণ ধার একখানা ছোরা—তুলে ধরলো চোখের সামনে। তারপর অতি সতর্কতার সঙ্গে জামার আড়ালে ছোরাখানা লুকিয়ে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ছায়ামূর্তি সরে গেলো জানালার একপাশে।

অরুণ বাবু চারদিক তাকিয়ে দেখে নিলো। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে। অন্ধকারে দ্রুত এগিয়ে চললো।

ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে অতি সংগোপনে অরুণ বাবুকে অনুসরণ করলো।

অরুণ বাবু টানা বারান্দা ধরে কিছুদূর এগিয়ে থমকে দাঁড়ালো তাকালো চারদিকে, তারপর অতি দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগলো।

পেছনে অনতিদূরে আত্মগোপন করে এগিয়ে চলেছে একটি ছায়ামূর্তি।

অরুণ বাবু বাড়ীর সামনে বাগানটার মধ্যে এসে দাঁড়ালো পুনরায় সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো পেছনে। এবার বাগানস্থ পুকুরঘাটে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো অরুণ বাবু। ছোরাখানা দ্রুত জামার আড়াল থেকে বের করে নিয়ে যেখনি সে পুকুরের পানিতে নিক্ষেপ করতে যাবে অমনি পেছন থেকে ছায়ামূর্তি খপ করে চেপে ধরলো অরুণ বাবুর হাতখানা।

চমকে ফিরে তাকালো অরুণ বাবু, মুখমন্ডল তার বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। অন্ধকার হলেও অরুণ বাবু চিনতে পারলে, অস্ফুট কণ্ঠে বললো—ইন্সপেক্টার!

গম্ভীর কণ্ঠে পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ লাহিড়ী বললেন—হাঁ, আমি। এবার আপনার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো তো?

অরুণ বাবু থমমত খেয়ে বললো— আপনি বিশ্বাস করুন, আমি মালতীকে খুন করিনি।

মিঃ লাহিড়ী হুইসেলে ফুঁ দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন পুলিশ এসে অরুণ বাবু আর ইন্সপেক্টারের সম্মুখে দাঁড়ালো।

মিঃ লাহিড়ী বললেন—বন্দী করো একে।

ইতিমধ্যে অরুণ বাবুর হাত থেকে ছোরাখানা মিঃ লাহিড়ী কেড়ে নিয়েছিলেন।

অরুণ বাবু হঠাৎ এভাবে বন্দী হবে ভাবতেও পারেনি। ভেবেছিলো সে ছোরাখানা পুকুরের পানিতে নিক্ষেপ করে নিজে নির্দোষ হবে। কিন্তু পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ লাহিড়ী অতি চতুর ব্যক্তি, তিনি লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে নিজেও দলবল নিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু একেবারে চলে গেলেন না। সবার অলক্ষ্যে লুকিয়ে পুনরায় ফিরে এলেন এই বাড়ীখানাতে। গোপনে অনুসরণ করলেন সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে।

মিঃ লাহিড়ী যা ভেবেছিলেন তাই, অরুণ বাবুকেই তাঁর প্রথম থেকে সন্দেহ হয়েছিলো।

পুলিশ ইন্সপেক্টার যখন অরুণ বাবুকে বন্দী করে নিয়ে চললেন, তখন হঠাৎ একটা হাসির শব্দ তাদের কানে এলো। মুহূর্তে ফিরে তাকালো সবাই, কিন্তু কোথা থেকে এই হাসির শব্দ ভেসে এলো কেউ বুঝতে পারলো না।

❑

পুলিশ অফিসে গত রাতের মালতী হত্যা রহস্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো। মিঃ লাহিড়ী, পুলিশ অফিসার মিঃ রায় ও থানা অফিসার মিঃ আলী ছিলেন সেখানে।

অরুণ বাবুই যে মিস মালতীর হত্যাকারী এ ব্যাপারে মিঃ লাহিড়ী একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে পড়েছেন। কারণ, তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন,

অরুণ বাবু রাতের অন্ধকারে পুকুরের পানিতে একখানা ছোরা নিক্ষেপ করতে যাচ্ছিলেন।

মিঃ লাহিড়ী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার যখন এই হত্যা ব্যাপার নিয়ে আলোচনায় রত ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করে এক যুবক। সুন্দর সুপুরুষ। শরীরে মূল্যবান পোশাক।

মিঃ লাহিড়ী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার বিস্ময়ভরা চোখে তাকালেন যুবকের দিকে।

লাহিড়ী কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার পূর্বেই যুবক বলে উঠলো—আমি মিঃ লুই—এর পুত্র মিঃ জন।

মিঃ লাহিড়ী উঠে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বললেন— আপনি মিঃ জন?

হাঁ, আমি মিস মালতীর হত্যা— সংবাদ জানতে পেরে এসেছি।

বসুন মিঃ জন। লাহিড়ী মিঃ জনকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন।

জন আসন গ্রহণ করলো।

মিঃ লাহিড়ী পুনরায় নিজ আসনে বসে সিগারেট কেসটা বের করে মেলে ধরলেন জনের সম্মুখে— গ্রহণ করুন।

জন মিঃ লাহিড়ীর সিগারেট কেস থেকে একটি সিগারেট তুলে নিয়ে বললো-ধন্যবাদ।

সিগারেটটা ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে অগ্নিসংযোগ করে ম্যাচের কাঠিটা বাড়িয়ে ধরলো জন মিঃ লাহিড়ীর দিকে।

মিঃ লাহিড়ী কথা শুরু-করবার আগেই বললো জন— মিস মালতীর হত্যাকান্ড আপনার নিকট কেমন মনে হয়?

মিঃ লাহিড়ী কিছুক্ষণ জনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—মিঃ জন, আপনি যদি কিছু মনে না করেন আমি আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

নিশ্চয়ই করুন। একটু থেমে বললো জন— মিস মালতীর হত্যা আমাকে বিচলিত করেছে ইন্সপেক্টার।

শুনেছি আপনি নাকি তাকে ভালোবাসতেন।

হাঁ ইন্সপেক্টার, আমি তাকে গভীরভাবে ভালোবাসতাম। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলো জন।

মিঃ লাহিড়ী তাকিয়ে দেখলেন জনের মুখ ব্যথাকরুণ হয়ে উঠেছে। এবার বললেন তিনি— আমার যতদূর বিশ্বাস আপনার প্রিয়াকে যে হত্যা করেছে তাকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি।

ক্রুদ্ধ, হিংস্র হয়ে উঠলো জনের মুখমন্ডল, বললো—সত্যি বলছেন?

হাঁ মিঃ জন, সত্যি বলছি।

আশ্চর্য, আপনি এত সহজেই হত্যাকারীকে গ্রেপ্তারে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু যাকে আপনারা গ্রেপ্তার করেছেন সেকি সত্যিই হত্যাকারী— এ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত?

কতকটা তাই।

কিভাবে আপনি তাকে হত্যাকারী বলে নিশ্চিত হলেন?

কোথায় মিঃ লাহিড়ী জনকে প্রশ্ন করবেন তা নয়, জনই মিঃ লাহিড়ীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললেন।

মিঃ লাহিড়ী জনের বুদ্ধিদীপ্ত কণ্ঠস্বরে এবং তার মধুময় ব্যবহার ও কথাবার্তায় মুগ্ধ হলো অতি স্বাচ্ছন্দে জনের প্রশ্নের জবাব দিয়ে চললেন। বললেন মিঃ লাহিড়ী —আমরা যাকে গ্রেপ্তার করেছি তাকে আপনি নিশ্চয়ই জানেন, তার নাম অরুণ বাবু!

হাঁ তাকে আমি জানি, যদিও তাকে দেখিনি কোনোদিন কিন্তু তার নাম আমি মিস মালতীর মুখে অনেকবার শুনেছি। আচ্ছা, এবার বলুন মিঃ লাহিড়ী, তাকে সন্দেহ করার কি কারণ থাকতে পারে?

মিঃ লাহিড়ী এবার বললেন—প্রথম কারণ, অরুণ ও মিস মালতী উভয়ে একই বাড়ীতে বাস করতো। দ্বিতীয় কারণ, যেদিন মিস মালতী নিহত হয় সেদিন অরুণ বাসায় বা সরাইখানায় ছিলো না। তৃতীয় কারণ, অরুণ বাবু হত্যারাত্রে গোপনে একখানা ছোরা লুকিয়ে পুকুরের পানিতে নিক্ষেপ করতে যাচ্ছিলো এবং সেই মুহূর্তে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আচ্ছা ইন্সপেক্টার, আপনার কি মনে হয় মিঃ অরুণ যে ছোরাখানা পুকুরের পানিতে নিক্ষেপ করতে যাচ্ছিলেন সেই ছোরা দিয়েই মিস মালতীকে হত্যা করা হয়েছে?

না, তেমন কোন প্রমাণ এখনও আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি, তবে সেই ছোরাখানা দিয়েই যে মিস মালতীকে খুন করা হয়েছে এটা সঠিক। নাহলে অরুণ বাবু রাতের অন্ধকারে আত্মগোপন করে ছোরাখানা পুকুরের পানিতে নিক্ষেপ করতে যেতো না।

এর অন্য কোনো কারণও তো থাকতে পারে।

সে অবশ্য ঠিক কিন্তু যতদূর সম্ভব সে-ই খুনী।

ইন্সপেক্টার, আপনারা যদি সম্মত হন তবে এই মালতী হত্যা রহস্য উদ্‌ঘাটনে আমি আপনাদের সহায়তা করতে পারি।

আনন্দভরা কণ্ঠে মিঃ লাহিড়ী বললেন— নিশ্চয়ই। এটা তো খুশীর কথা। তাছাড়া মালতীর বাবা বাসুদে বাবু শুনলে তিনিও আনন্দিত হবেন।

সত্যি ইন্সপেক্টার, মালতীর হত্যা আমাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত করে তুলেছে। জন কথার ফাঁকে দাঁতে দাঁত পিষলো। একটু থেমে পুনরায় বললো—মালতীর পোষ্টমর্টেমের রিপোর্টখানা আমাকে অনুগ্রহ করে দেখাবেন?

নিশ্চয়ই। মিঃ জন, আপনার মত একজন মহান ব্যক্তিকে আমরা সঙ্গী হিসেবে পেলে উপকৃত হবো। আপনি আমাদের সহায়তায় এগিয়ে আসছেন, আমরা ও পুলিশ বাহিনী এ ব্যাপারে আপনাকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবো।

ধন্যবাদ ইন্সপেক্টার। কথাটা বলে জন উঠে দাঁড়ালো। আবার দেখা হবে। গুডবাই।

ইন্সপেক্টার এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার উঠে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।

জন বেরিয়ে গেলো।

আসন গ্রহণ করে বললেন মিঃ লাহিড়ী— ধনবান লুই-এর পুত্র জন এতদিন লন্ডনে ছিলেন, সবে ফিরে এসেছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, উনারও পরিচয় ছিলো বাসুদেবের মেয়ে মালতীর সঙ্গে!

মিঃ রায় বললেন— মিস মালতীর সঙ্গে শহরের প্রায় ধনবান ব্যক্তিরই পরিচয় ছিলো, অবশ্য এটা তার বাবা বাসুদেবেরই সহযোগিতায় হয়েছে।

মিঃ লাহিড়ী বললেন— এতোবড় একটা সরাইখানার মালিক হয়ে বাসুদেব শর্মা নিজ কন্যাকে অর্থের লোভে ব্যভিচারে লিপ্ত করেছিলো। সুন্দরী যুবতীর লোভে পুরুষ পতঙ্গের দল ছুটে আসতো তার সরাইখানায়।

মৃত মালতীর মৃত্যু রহস্য নিয়ে পুনরায় মিঃ লাহিড়ী তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত হলেন।

❑

একদিন দ্বিপ্রহরে কুটিরের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে নূরী, মনিও ঘুমিয়ে ছিলো পাশে। হঠাৎ মনির ঘুম ভেঙ্গে গেলো। খেজুর পাতার শয্যায় উঠে বসলো মনি, তাকালো নূরীর ঘুমন্ত মুখের দিকে। দেখলো মাম্মি ঘুমাচ্ছে।

দুষ্ট মনি নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো বাইরে। পা পা করে এগিয়ে চললো সামনের দিকে। কুটিরের মধ্যে নূরী ঘুমিয়ে আছে, কেউ তাকে বাধা দেবার নেই। ছোট্ট মনি আপন মনে চলতে লাগলো।

মনি সোজা বনের পশ্চিম দিকে এগুচ্ছে। বয়স তার বেশী নয়–মাত্র তিন বছরে পা দিয়েছে মনি, বুদ্ধি বলতে কিছুই তেমন হয়নি। কিছুদূর এগুনোর পর মনি দেখলো, তার সামনে সুন্দর একটা ফুলের বাগান, নানা রকম ফুল ফুটে রয়েছে সেখানে। মনি আলগোছে প্রবেশ করলো বাগানের মধ্যে। একটা সুন্দর ফুল দেখে মনি যেমনি ফুলটা ছিঁড়ে ফেললো, অমনি একটি ধুম্ররাশি আচ্ছন্ন করে ফেললো গোটা বাগানটাকে। মনির হাত থেকে ফুলটা খসে পড়লো, কেঁদে উঠলো মনি। কে একজন নারী মূর্তি তখন মনিকে কোলে তুলে নিয়েছে।

সন্ন্যাসীর আহ্বানে ঘুম ভেঙ্গে গেলো নূরীর। সচকিতভাবে উঠে পাশে তাকাতেই অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—মনি কোথায়?

সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো— বৎস, মনি মায়াজালে আবদ্ধ হয়েছে।

নূরী উম্মাদিনীর ন্যায় ছুটে চললো সন্ন্যাসী বাবাজীর নিকটে। আছাড় খেয়ে পড়লো তাঁর পায়ের কাছে—বাবাজী এখন উপায়?

কোনো উপায় নেই আর মনিকে উদ্ধারের—কারণ, সে এখন মায়ারাণীর মায়াজালে আবদ্ধ হয়েছে।

নূরী আকুলভাবে কেঁদে উঠলো—'তাকে আর ফিরে পাবো না তাহলে গুরুদেব?

বৎস, আমি পূর্বেই বলেছিলাম,এ বনের সর্বত্র আমার আধিপত্য রয়েছে শুধু পশ্চিম দিকে ছাড়া, ঐ দিকে আমার কোনো বল খাটবে না।

নূরী ব্যাকুল কণ্ঠে বললো— কিন্তু মনিকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না। বলুন গুরুদেব, আমি কি করে তাকে ফিরে পেতে পারি?

সন্ন্যাসী বাবাজী এবার বলে উঠলেন—পশ্চিম ছাড়া তোমার মনি যেখানেই যেতো, সে কেমন আছে কি করছে সব তোমাকে বলতে পারতাম বৎস, এখন আমি অক্ষম।

তবে আমিও ঐ পশ্চিমে যাবো, দেখবো আমার মনি কোথায়, কেমন আছে?

সর্বনাশ! ওদিকে তুমি যেও না, গেলে আর কোনোদিন ফিরে আসতে পারবে না।

❑

সন্ন্যাসী বাবাজী যতই নিষেধ করুন, নূরী মনির জন্য অত্যন্ত অধীর হয়ে পড়লো। সর্বক্ষণ চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে চললো। একদিন নির্জন প্রভাতে নূরী বনের পশ্চিম দিক লক্ষ্য করে রওনা দিলো—মরতে হয় সেও মরবে, তবু মনির সন্ধান নেবে সে।

ঘন বনের অন্তরালে নূরী এগিয়ে চললো। সে জানে, ওখানে গেলে আর কোনোদিন ফিরে আসতে পারবে না, এই তার জীবনের শেষ অধ্যায়—তবু নূরী নির্ভীকভাবে এগুচ্ছে।

পেছন থেকে ভেসে এলো সন্ন্যাসী বাবাজীর কণ্ঠস্বর—যেও না, যেও না, বিপদ রয়েছে।

নূরী দু'হাতে কান চেপে ধরলো, তারপর দ্রুত পা চালালো।

কিছুদুর এগুতেই সামনে তাকিয়ে দেখলো নূরী—সুন্দর একটি বাগান, ফুলে ফুলে ভরে রয়েছে বাগানটা। নূরী মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে রইলো বাগানটার দিকে, ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেলো নূরী মনির কথা।

নিজের অজ্ঞাতেই নূরী প্রবেশ করলো বাগানে। সামনে একটি সুন্দর ফুল গাছ দেখে একটি ফুল ছিঁড়ে ফেললো হঠাৎ সে। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ধূঁয়া আচ্ছন্ন করে ফেললো নূরীর চারদিকে। নূরী চীৎকার করে উঠলো–একি

হলো একি হলো! মুহূর্তে অনুভব করলো সে— তার হাত দু'খানা লৌহশিকলে আবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রাণপণ চেষ্টা করেও নূরী হাত দু'খানাকে মুক্ত করে নিতে সক্ষম হলো না।

তারপর একসময় নূরী দেখলো, তার চারদিকের ধূম্ররাশি ক্রমান্বয়ে মিশে আসছে। এবার পরিষ্কার দেখতে পেলো—যেখানে সে দাড়িয়েছিলো সেখানে কোন বাগান নেই, একটা অন্ধকার কক্ষে সে বন্দিনী। হাত-পা শৃঙ্খলাবদ্ধ! আকুল কণ্ঠে চীৎকার করতে গেলো কিন্তু একটু শব্দও তার মুখ দিয়ে বের হলো না। নূরী এবার বুঝতে পারলো, সন্ন্যাসী বাবাজীর কথা মিথ্যে নয়, সে মায়ারাণীর মায়াজালে আবদ্ধ হয়েছে। কি করবে নূরী। একে মনির জন্য মন তার আকুল, তারপর নিজের অবস্থাও মহাসঙ্কটময়। মনিকে উদ্ধার করতে এসে সেও বন্দিনী হলো। চারদিকে তাকালো নূরী–নিঃশ্বাস যেন তার বন্ধ হয়ে আসছে—কিন্তু কোথায় মনি।

নূরী যখন মনির জন্য এবং নিজের অবস্থা ভেবে আকুল হয়ে কাঁদছে, ঠিক সেই মুহূর্তে দেখলো একটি নারীমূর্তি তার সামনে এসে দাঁড়ালো, সাদা ধবধবে পরিচ্ছদে দেহ তার আবৃত— মাথায় মুকুট, হাতে একটা দণ্ডের মত কিছু রয়েছে। চোখ দুটো কাজল টানা, ভ্রূ দু'টি ধনুকের মত বাঁকা—অদ্ভুত দেখতে নারীমূর্তিটা।

নূরীর সামনে দাঁড়িয়ে নারীমূর্তি বললো—কেঁদে আর কোনো লাভ হবে না, আর কোনোদিন তুমি মায়ারাজ্য থেকে বাইরে যেতে পারবে না। অট্টহাসি হেসে উঠলো নারীমূর্তি–হাঃ হাঃ হাঃ---

নূরী শিউরে উঠলো, করুণ চোখে তাকালো নারীমূর্তির দিকে, তারপর মিনতির সুরে বললো—আমার মনি কোথায়? আমার মনি?

আবার হেসে উঠলো নারীমূর্তি অদ্ভুতভাবে—তোমার মনি...হাঃ হাঃ হাঃ, তোমার মনিকেও আর কোনোদিন ফিরে পাবে না।

কি বললে, মনিকে আর কোনোদিন ফিরে পাবো না?

না না। জানো এ কোন্ রাজ্যে তুমি এসেছো?

জানি মায়ারাণী, আমি এখন তোমার মায়ারাজ্যে এসেছি।

হাঁ, তুমি আমার বন্দিনী।

আমার অপরাধ?

আমার মায়ারাজ্যে যে প্রবেশ করবে তাকেই আমার বন্দী হতে হবে।

বলো আমার মনি কোথায়?

সেও বন্দী।

পিশাচী, এতটুকু শিশুকে তুমি বন্দী করেছো?

আমার কাছে শিশু বা যুবক-বৃদ্ধ বলে কিছু নেই—আমার ঐ মায়া-বাগানে যে প্রবেশ করবে, সে-ই আবদ্ধ হবে আমার মায়াজালে! শুধু তুমি নও, তোমার মত শত শত নর-নারী যুবক-বৃদ্ধ-শিশু আমার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে মায়ারাজ্যে বন্দী হয়ে রয়েছে। এখানে কারও সাধ্য নেই কাউকে মুক্ত করে নিয়ে যায়।

নূরী অবাক হয়ে মায়ারাণীর কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলো। এসব কি শুনছে সে। পৃথিবীতে কি এমন জিনিস আছে যা যাদুবিদ্যা বা মায়াজালে মানুষকে এভাবে আচ্ছন্ন করতে পারে! এমন তো সে কোনোদিন শোনেনি বা দেখেনি। একি অদ্ভূত ব্যাপার সে দেখছে? শুধু দেখছে নয়, মন-প্রাণে উপলব্ধি করছে। নূরী ভাবে, কি করে এই মায়ারাণীর মায়াজাল থেকে মুক্তি পাবে।

নূরী যখন আপন চিন্তায় বিভোর তখন হঠাৎ মায়ারাণী ধীরে ধীরে হাওয়ায় মিশে গেলো। বিস্ময়স্তব্ধ চোখে তাকিয়ে রইলো নূরী—মায়ারাণী যে স্থানটিতে অদৃশ্য হলো সেইদিকে।

হঠাৎ নূরীর কানে ভেসে এলো মনির কান্নার শব্দ। উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদছে মনি, কেউ যেন ওকে মারছে বা কোনো রকম কষ্ট দিচ্ছে।

নূরী ক্ষিপ্তের ন্যায় ছুটে গেলো সেইদিকে, যেদিক থেকে ভেসে এসেছিলো কান্নার শব্দটা, কিন্তু একি! শব্দটা ঠিক কোন্ দিক থেকে আসছে বোঝা যাচ্ছে না। নূরী থমকে দাঁড়ালো, সামনে সুউচ্চ একটা প্রাচীর তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। মনির কান্না যেন ঐ প্রাচীরটার ওপাশ থেকেই আসছে বলে মনে হচ্ছে তার। নূরী অনেক চেষ্টা করেও প্রাচীর পার হতে পারলো না। নূরী যতই দেখছে ততই আশ্চার্য হচ্ছে—মায়াজাল সে কোনোদিন বিশ্বাস করতো না, আজ বিশ্বাস না করে পারলো না। পৃথিবীতে যাদু বা মায়াজালও রয়েছে। কে এই মায়ারাণী যার যাদুবলে এত সব হতে পারে। নূরীও কম মেয়ে নয়, সে দেখে নেবে মায়ারাণীর মায়াজাল ছিন্ন করতে পারে কিনা।

ততক্ষণে মনির কান্নার শব্দ থেমে গেছে। কেমন যেন একটা গম্ভীর নীল রশ্নি তার চারদিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কোথায় সেই কক্ষ, নূরী দেখলো

এবার একটা গোলাকার প্রাচীর ঘেরা জায়গায় সে নিজে দাঁড়িয়ে আছে।

মায়ারাণীর মায়াজালে বন্দিনী নূরী।

পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধই নেই, কোথায় এসেছে, কোথায় আছে, সে নিজেই বুঝতে পারছে না। সব সময় নূরী অনুভব করে তার চারপাশে কোন অশরীরী আত্মার দীর্ঘশ্বাস। কেউ যেন অতি লঘু পদক্ষেপে তার চারদিকে হেঁটে বেড়ায়। কখনও কখনও নূরী তার আশেপাশে অনতিদূরে শুনতে পায় ফিস ফিস কণ্ঠস্বর। ভয়ে নূরী পালাতে চায়, কিন্তু কোথায় পালাবে। যে দিকে যায় সেইদিকেই সে দেখতে পায় সুউচ্চ প্রাচীর তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। এক পাও এগুতে পারে না নূরী, বসে পড়ে মাথায় হাত দিয়ে। সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে, সে জীবিত আছে কিনা, তাই সন্দেহ জাগে তার মনে।

❑

মিঃ লুই এর তিনতলা বাড়ী।

শহরের সেরা ধনবান ব্যক্তি মিঃ লুই। সংসারে তার একমাত্র সন্তান জন ছাড়া আর কেউ নেই। মিঃ লুই গত কয়েক মাস হলো ব্যবসার ব্যাপারে জার্মানে অবস্থান করছেন, বাড়ীতে রয়েছে শুধু জন ও দু'জন কর্মচারী।

জন একটু আলাদা ধরনের যুবক, সব সময় একা নির্জনে থাকতে ভালোবাসে। সংসারের যত কাজকর্ম বা অন্যসব তত্ত্বাবধান করে তার কর্মচারী দু'জন। নির্জন কক্ষে জন সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলে, আর মোটা মোটা, বই পড়ে। লন্ডন থেকে ফিরে আসার পর সে বাইরে বের হওয়া এক রকম প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। মনের মত কাউকে পায় না তাই সে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে নানা রকম বই-পুস্তকের মধ্যে। মাঝে মাঝে বাসুদেবের সরাইখানায় দেখা যেতো মিঃ জনকে, গভীর রাতে যখন সরাইখানার লোকজন বিদায় গ্রহণ করতো তখন মিঃ জনের নতুন ঝকঝকে নীল রঙের বিরাট গাড়ী এসে দাঁড়াতো বাসুদেবের সরাইখানার সামনে। পর পর দুটো হর্নের আওয়াজ হতো—অমনি ছুটে বেরিয়ে আসতো মালতী, সুমিষ্ট কণ্ঠে ধ্বনি করে উঠতো—হ্যালো জন, এসে গেছো?

জন নেমে আসতো গাড়ী থেকে, উভয়ে হাত ধরে এগিয়ে যেতো সরাইখানার একটি নির্দিষ্ট কক্ষে, তারপর চলতো নাচ-গান, হাসি-গল্প। মালতীর কাছে জন একেবারে যেন পালটে যেতো, কোথায় চলে যেতো তার গুরুগম্ভীর ভাব।

এবার জন লন্ডন থেকে ফিরে আসার পর বাসুদেবের সরাইখানায় একটি দিনের জন্যও যায়নি বা মালতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেনি। মালতী জনের লন্ডন থেকে ফিরে আসার সংবাদ পেয়ে নিজেই গিয়ে দেখা করে এসেছিলো তার সঙ্গে!

সেই মালতীর আকস্মিক মৃত্যু জনকে বিচলিত করবে তাতে অবান্তর কি আছে?

আজও গভীর রাতে জন মালতীর মৃত্যু-রহস্য নিয়েই গভীরভাবে চিন্তা করছিলো। সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলেছে সে।

হঠাৎ একটা শব্দ শোনা গেলো তার জানালার শার্শীর পাশে। খুট করে একটা শব্দ। চমকে উঠলো জন, হাতের সিগারেটটা এ্যাসট্রের ওপর রেখে উঠে দাঁড়ালো, নিঃশব্দে এগিয়ে চললো জানালার দিকে। স্পষ্ট দেখলো— একটা আবছা কালো মূর্তি দ্রুত সরে গেলো জানালার পাশ থেকে।

জন ভ্রূকুঞ্চিত করে কিছু ভাবলো, পুনরায় ফিরে এলো নিজের আসনে, সুন্দর ললাটে ফুটে উঠলো গভীর চিন্তারেখা।

ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে চললো। জনের চোখে ঘুম নেই। প্রতিহিংসার একটা তীব্র জ্বালা তার অন্তরে দাহ সৃষ্টি করে চলেছে। মালতীর হত্যাকারী কে, তাকে খুঁজে বের করতেই হবে...

পায়চারী করছে জন, মালতীকে সে ভালবাসতো ঠিকই। সরাইখানার নর্তকী বলে ঘৃণাও করতো সে মনে মনে—তাই বলে তার হত্যা চিন্তা করতে পারে না সে কোনো সময়! জন এবারে ড্রয়ার খুলে ফেললো—দ্রুতহস্তে কাগজপত্র বের করে কি যেন খুঁজতে লাগলো, পর পর কয়েকটা ড্রয়ার খুলে হঠাৎ একটা ডায়রী তুলে নিলো হাতে। মুহূর্তে জনের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

ডায়রী খানা নিয়ে ফিরে এলো জন নিজের শয্যায়। টেবিল ল্যাম্পের সলতে বাড়িয়ে দিয়ে ডায়রী খানা মেলে ধরলো চোখের সামনে।

পরদিন জন একটা টেলিগ্রাম পেলো, তার ভাবী পত্নী মিস এ্যানি আসছে, সন্ধ্যায় এরোড্রামে তাকে রিসিভ করে আনতে যেতে হবে।

টেলিগ্রাম পাবার পর জনের সুন্দর মুখমন্ডল গম্ভীর হয়ে উঠলো। দাঁতে অধর দংশন করে কি যেন ভাবতে লাগলো সে। তারপর একসময় ড্রইংরুমে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলো। দেয়ালে টাঙ্গানো তার নিজের

ছবিখানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, নির্বাক নয়নে তাকিয়ে রইলো ছবিখানার দিকে।

সন্ধ্যায় এ্যানিকে আনবার জন্য গাড়ী নিয়ে এরোড্রামে হাজির হলো জন।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ একটা মেয়েলী কণ্ঠস্বর—হ্যালো জন, তুমি এখানে?

জন একটু থতমত খেয়ে বললো—হাঁ, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

ততক্ষণে যুবতীটি জনের পাশে এসে তার কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরেছে—ভালো আছো তো?

জন একটু হেসে বললো—আছি। তুমি?

আমিও ভাল। চলো।

গাড়ীতে উঠে বসলো ওরা দু'জন।

জন নিজে ড্রাইভ করে চললো। এ্যানি বসলো তার পাশে।

জনের মুখ গম্ভীর, আপন মনে ড্রাইভ করছে সে।

মিস এ্যানি জনের কাঁধে মাথা রেখে আবেগভরা কণ্ঠে বললো—জন, এ দু'বছরে তুমি যেন কেমন হয়ে গেছো?

সামনে দৃষ্টি রেখে বললো জন—কেমন হয়ে গেছি এ্যানি?

ঠিক যেমন ছিলে তার উল্টো।

মানে?

এরোড্রামে আমাকে দেখেও তুমি যেন চিনতেই পারছিলে না, আমি কথা বললাম তবে তুমি জবাব দিলে।

এ্যানি, আমি আজকাল চোখে একটু কম দেখি কিনা। তা ছাড়া চোখে কালো চশমা ছিলো, সন্ধ্যার ঝাপসা অন্ধকারে তোমাকে স্পষ্ট দেখতেই পাইনি।

চোখে কম দেখো! কোনো অসুখ বিসুখ হয়েছিলো নাকি তোমার?

হাঁ, মাঝখানে অসুখে অনেক ভুগেছি।

এখন কেমন দেখো?

বললাম তো কিছুটা কম, সেই কারণেই কালো চশমা পরি।

বড় দুঃখ হচ্ছে তোমার জন্য জন।

কিন্তু কি উপায় আছে বলো!

জন, তোমার স্বরও যেন কেমন পালটে গেছে, নতুন লাগছে তোমাকে।

অনেক দিন পর কিনা!

জন, সত্যি এ দু'বছর আমি তোমাকে ছেড়ে কিভাবে যে কাটিয়েছি, শুধু আমিই জানি। সেই যে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে এলে— মনে পড়ে সেদিনের কথা?

পড়ে।

সত্যে তোমার চিঠি পেয়ে আমি সেই দিনটির প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিলাম। এবার দেখবো তোমার কথা কতখানি সত্য হয়।

আচ্ছা।

নাঃ আজ তুমি বড্ড স্বল্পভাষী হয়ে গেছো জন।

মিস এ্যানি.....

মিস মিস—কই তুমি তো এর আগে মিস বলে ডাকোনি কোনোদিন!

হাসলো মিঃ জন—মিস বলতে আমার ভাল লাগছে তাই।

মিঃ লুইয়ের বাড়ীর গেটে গাড়ী এসে থামলো।

দারোয়ান এসে গাড়ীর দরজা খুলে ধরলো, নেমে দাঁড়ালো এ্যানি, ততক্ষণে জনও নেমে দাঁড়িয়েছে।

এ্যানি সহ জন অন্তঃপুরে প্রবেশ করলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা থামের আড়ালে সরে দাঁড়ালো একটি ছায়ামূর্তি।

এ্যানিকে তার বিশ্রামকক্ষে পৌঁছে দিয়ে জন নিজের কক্ষে প্রবেশ করলো। হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গেলো পাশের দেয়ালে, থামের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ছায়ামূর্তির ছায়া এসে পড়েছে সেই দেয়ালে। জনের মুখে ফুটে উঠলো একটা হাসির রেখা! নিজের কক্ষে প্রবেশ করে শয্যায় গা এলিয়ে দিলো সে।

অল্পক্ষণ পর বয় এসে জানালো—স্যার, একজন ভদ্রলোক আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান।

মিঃ জন উঠে পড়লো—চলো।

হলঘরে প্রবেশ করতেই মিঃ লাহিড়ীকে দেখতে পেলো জন। মনে মনে বিস্মিত হলেও মুখোভাব প্রসন্ন রেখে বললো—হঠাৎ আপনি?

দেখা করতে এলাম।

বসুন ইন্সপেক্টার।

মিঃ লাহিড়ী আসন গ্রহণ করলেন।

জনও আসন গ্রহণ করে বললো—মিস মালতীর হত্যা রহস্যের কিছু উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছেন কি?

এখনও কোন নতুন ক্লু আবিষ্কার হয়নি। আমি ঐ কারণেই আপনার নিকটে এলাম মিঃ জন।

বলুন?

আপনি বলেছিলেন, মালতী হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটনে আপনি আমাদের যথাসাধ্য সহায়তা করবেন।

হাঁ ইন্সপেক্টার, আমি করবো।

আপনি সেই যে চলে এলেন, এ ক'দিনের মধ্যে আর একটি বারও আমার সঙ্গে দেখা করলেন না। একটু বাঁকা হাসি হাসলেন মিঃ লাহিড়ী।

জন গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আপনার ওখানে না গেলেও আপনার সাক্ষাৎলাভ আমার প্রায়ই ঘটেছে ইন্সপেক্টার—আমরা উভয়ে উভয়কে দেখলেও কোনো আলাপ-আলোচনা হয়নি এই যা।

তার মানে?

মানে আপনি আমাকে দেখেছেন, আমি আপনাকে দেখেছি।

আপনার হেঁয়ালি ভরা কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মিঃ জন?

গভীরভাবে চিন্তা করলে পারবেন। যাক, শুনুন ইন্সপেক্টার, আমি আপনার অফিসে গিয়ে দেখা না করলেও মালতী হত্যারহস্য উদঘাটনে অত্যন্ত আগ্রহশীল রয়েছি। একদিন মালতীকে সত্যি আমি গভীরভাবে ভালোবাসতাম....এবং সেই কারণেই আমি মালতীর হত্যাকারীকে আবিষ্কার করতে চাই।

এমন সময় এ্যানি সেই কক্ষে প্রবেশ করলো। হাতমুখ ধুয়ে নতুন ড্রেসে সজ্জিত হয়েছে এ্যানি, শুভ্র মোলায়েম পোশাকে তাকে খুব সুন্দর লাগছিলো।

এ্যানি ঘরে প্রবেশ করতেই মিঃ লাহিড়ী বিস্ময়ভরা চোখে তাকালেন তার দিকে।

জন একটু হেসে বললো—ইনি আমার ভাবী পত্নী মিস এ্যানি।

মিঃ লাহিড়ী একটু হাসবার চেষ্টা করলেন।

জন এবার এ্যানির নিকটে মিঃ লাহিড়ীর পরিচয় দিলো—আর ইনি আমাদের পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ লাহিড়ী। মিঃ বাসুদেব শর্মার কন্যা মিস মালতীর হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটন করার ব্যাপারে উনি আমার নিকটে এসেছেন।

এ্যানি অবাক হলো কথাটা শুনে, প্রশ্নভরা চোখে তাকালো জনের দিকে।

জন বললো–সব তোমাকে বলবো এ্যানি, কেমন?

আচ্ছা।

এখন তুমি ভেতরে যাও এ্যানি, ওনার সঙ্গে কথা শেষ করে আসছি।

মিঃ লাহিড়ী হেসে বললেন—আপনি যেতে পারেন মিঃ জন, আজ আমার কথা শেষ হয়েছে।

ধন্যবাদ।

মিঃ লাহিড়ী উঠে দাঁড়ালেন, জন তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

মিঃ লাহিড়ী বিদায় হতেই এ্যানি জনের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো, ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললো—মিস মালতীর হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটনে তোমার নিকটে তার কি দরকার জানতে পারি কি?

নিশ্চয়ই পারো এ্যানি। চলো বলছি সব।

চলো।

মিঃ জন আর এ্যানি গিয়ে বসলো পাশাপাশি দু'টি সোফায়। এ্যানি প্রশ্ন করলো—বলো মিস মালতী কে?

মালতী! মালতী আমার এক পরিচিত যুবতী।

বাঁকা চোখে তীব্রকণ্ঠে বললো এ্যানি—শুধু কি পরিচিত না অন্য কোনো সম্বন্ধ ছিলো তোমার সঙ্গে তার?

এ্যানি!

তুমি তাহলে কেন বলোনি এতদিন তার কথা?

এমন সামান্য কথাও তোমাকে বলতে হবে এটা আমার ধারণার বাইরে।

জন, তোমার ব্যবহার তো এমন ছিলো না। তোমার কথাবার্তা আমার কাছে বড্ড নীরস বলে মনে হচ্ছে। আমি জানি, তুমি আমাকে ছাড়া এ পৃথিবীর কাউকে ভালবাসতে পারো না।

হাঁ এ্যানি। চলো রাত অনেক হলো—শোবে চলো।

এ্যানি জনের হাত ধরে উঠে দাঁড়ালো—চলো ডার্লিং।

জন এগুলো, এ্যানির হাতের মুঠোয় তার হাতখানা।

জনের হাত ধরে কক্ষে প্রবেশ করলো এ্যানি। শয্যায় নিজের দেহটা এলিয়ে দিয়ে বললে—জন, তুমি শোবে না?

আমার কাজ আছে এ্যানি, তুমি ঘুমোও।

ডার্লিং, তুমি কেমন যেন হয়েগেছ। শয্যায় উঠে বসলো এ্যানি।

জন তখন দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে।

এ্যানি জনের দক্ষিণ হাত চেপে ধরলো—চলে যাচ্ছো?

হাঁ।

জন, তোমার কি হয়েছে বলো তো? এসো, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। এ্যানি জনের হাত ধরে টেনে এনে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে নিজে বসে পড়লো তার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে। তারপর বঙ্কিল গ্রীবা দুলিয়ে বললো—কি বলেছিলে মনে নেই তোমার?

জন চোখের কালো চশমাটা ঠিক করে নিয়ে বলে—এদিকে নানা ঝামেলায় সব ভুলে গেছি এ্যানি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

অভিমানে এ্যানির মুখমন্ডল আরক্ত হয়ে আসে। রাগত কণ্ঠে বলে ওঠে—তুমি কি মানুষ। জন, আমি ভেবেছিলাম সত্যি তুমি আমাকে ভালবাসো—কিন্তু সব তোমার ছলনা—সব মিথ্যা, ভুয়ো।

এ্যানি!

না, আজই আমি চলে যাবো এখান থেকে।

এ্যানি শান্ত হও।

না না, আমি তোমার কোন কথাই শুনতে চাইনে। কি ভয়ঙ্কর লোক তুমি। দাও ফিরিয়ে দাও তুমি আমার সেই জিনিসটা।

জন নির্বাক হয়ে বসে থাকে, এ্যানি কথায় সে কোনো জবাব দেয় না।

এ্যানি ক্ষিপ্তের ন্যায় চীৎকার করে উঠলো—এবার আমি সব বুঝতে পেরেছি, তুমি সেই মালতীকে ভালবেসেছিলে!

এ্যানি যদি তাই মনে করো, তবে সত্যি তাই।

কি বললে, জানো আমার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?

জানি! বিয়ে করবো কথা দিয়েছিলাম—যদি না করি?

জন! চীৎকার করে ওঠে এ্যানি—দাও, আমার জিনিসটা তবে ফিরিয়ে দাও তুমি।

দেবো।

এখনিই দাও, আমি চলে যাবো তোমার এখান থেকে।

জন ধীরে ধীরে নমনীয় হয়ে এলো, নরম গলায় বললো—এ্যানি, তুমি একি ছেলেমানুষি করছো! যেখানে আমাদের বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে।

না, আমি তোমার কোনো কথা শুনবো না। তুমি আমার জিনিস ফেরত দাও।

এ্যানি, তুমি বিশ্বাস করো—আমি তোমাকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসিনি, বাসতে পারিনা। এ্যানি, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। জন এ্যানির হাত দু'খানা চেপে ধরে বিনীতভাবে কথাগুলো বললো।

এ্যানির মুখোভাব পরিবর্তন হয়ে এলো, গলার স্বর শান্ত করে বললো—জানি, জানি বলেই তো আমি ছুটে এসেছি তোমার পাশে! একটু থেমে পুনরায় বললে—কিন্তু তোমার অবহেলা ভাব আমাকে..

এ্যানি, আমি একটা দুশ্চিন্তায় আছি, তাই তোমার সঙ্গে ঠিক পূর্বের মত আচরণ করতে পারছিনে। জানো এ্যানি, মিস মালতীর হত্যা ব্যাপারে পুলিশ আমাকেও সন্দেহ করছে, এবং সদা আমার ওপর তাদের সর্তক দৃষ্টি রয়েছে।

কেন পুলিশ তোমাকে সন্দেহ করছে? তুমি যে বললে—মালতীর সঙ্গে, তোমার কোন সম্বন্ধ ছিলো না?

না এ্যানি, তুমি বিশ্বাস করো, মিস মালতীকে আমি সব সময় এড়িয়ে চলতাম। কিন্তু মালতী আমার পেছনে জোঁকের মত লেগে থাকতো। আমি তাঁকে ঘৃণা করতাম।

জন, সত্যি বলছো?

সম্পূর্ণ সত্যি এ্যানি।

ডার্লিং!

এ্যানি!

ডালিং, তুমি ঐ কালো চশমা খুলে ফেলো। এ্যানি জনের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে।

জন ধীরে ধীরে এ্যানির কোমল বাহু দু'টি সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়—এ্যানি, আমার জরুরী একটা কাজ আছে। এক্ষুণি বাইরে যাবো।

উঁ হুঁ, আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো না, ডার্লিং!

প্রিয়ে তুমি জানো না কত জরুরী আমার কাজ। চলি–গুডবাই!

অস্ফুট কণ্ঠে বললো এ্যানি—গুডবাই!

জন বেরিয়ে গেলো।

এ্যানি বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো বিছানায়।

❑

নূরী আর মনি মায়ারাণীর মায়াজালে বন্দী। শত চেষ্টা করেও নূরী নিজেকে উদ্ধার করতে পারলো না কিংবা মনির সাক্ষাৎ পেলো না। চোখের পানিতে নূরীর বুক ভেসে গেলো, তবু মায়ারাণীর মনে মায়া হলো না।

অদ্ভুত এক নারী এই মায়ারাণী। আসলে সে নারী নয়, যাদুকর হরশঙ্কর নারীর রূপ নিয়ে নূরীর নিকট হাজির হতো, তাকে নানা ভাবে ভোলাতে চেষ্টা করতো। কখনও বা যাদুর দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখতো।

মাঝে মাঝে হরশঙ্কর মনিকে নিয়ে শহরে যেতো, নানা যাদুর খেলা দেখাতো, সুযোগ পেলে মানুষকে হত্যা করে তার যথাসর্বস্ব লুটে নিতো। অতি পিচাশ পাপাচার এই হরশঙ্কর। নারীর রূপে নূরীকে নানা ছলনায় ভোলাতে চেষ্টা করলেও হরশঙ্কর নূরীকে সংস্পর্শ করতে পারলো না।

দিনের পর দিন নূরী এই গহন বনে একটি অন্ধকারময় কুটিরের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে চললো। একদিকে মনির অদর্শন, অন্যদিকে এই বন্দিনী অবস্থা।

যাদুকর হরশঙ্কর শুধু নূরী আর মনিকেই বন্দী করেনি, তার কবলে আরও অনেক নারী ও শিশু নরক জ্বালা ভোগ করছে তীব্র কষ্ট ভোগের পর কেউ এখনও বেঁচে আছে, কেউ চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছে ধরণীর বুক থেকে।

যাদুকর হরশঙ্কর শুধু যাদুকরই নয়—বনাঞ্চলে যেমন তার আধিপত্য, তেমনি শহরেও তার বিচরণ সর্বত্র।

সপ্তাহে হরশঙ্কর দু'দিন তার যাদুর খেলা দেখাতে শহরে যেতো। মনি নিতান্ত শিশু, কাজেই প্রায় দিনই বিভিন্ন ছেলে নিয়ে যেতো সে দেশ হতে দেশান্তরে। কোন শহর বা নির্দিষ্ট জায়গায় হরশঙ্কর স্থায়ীভাবে থাকতো না। নানা বেশে নানা দেশে সে যাদুর খেলা দেখাতে চলে যেতো।

বিশেষ করে রাতের বেলায় সে যাদু খেলা দেখাতো। তার কয়েকজন অনুচর ছিলো যখন হরশংকর খেলা দেখাতো তখন তার নানা ছদ্মবেশে থাকতো তার আশেপাশে। হরশঙ্করের যাদু খেলায় যখন দর্শকগণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়তো, ঠিক সেই মুহূর্তে তার সঙ্গীরা হরণ করতো তাদের মূল্যবান সামগ্রী।

কয়েকজন যুবতীও ছিলো হরশংকরের বনের কুটিরে। তাদের নিয়ে মাঝে মাঝে সে শহরে নাচ দেখাতো ও খেলা দেখিয়ে পয়সা উপার্জন করতো।

নূরীকেও হরশংকর সেইভাবে তৈরী করে নিতে চেষ্টা করছিলো। নিজে নারীর ছদ্মবেশে নানা কৌশলে তাকে বশীভূত করছিলো। কিন্তু নূরী সাধারণ মেয়ে নয়, তাকে আয়ত্তে আনা যাদুকর হরশংকরের কাজ নয়। যাদুকর হরশংকর বেশীদিন নূরীর কাছে আত্মগোপন করে নারীর ছদ্মবেশে থাকতে পারলো না। একদিন ধরা পড়ে গেলো সে নূরীর কাছে।

সেদিন নূরীকে কাছে টেনে বললো মায়ারাণী বেশী হরশংকর—তোমাকে আমি বোনের মত ভালবাসি। তুমি আমাকে ভালো বাসতে চেষ্টা করো। তোমার লাল টুকটুকে সুন্দর মুখখানা আমাকে উন্মত্ত করে তুলেছে কথার ফাঁকে সে নূরীকে আকর্ষণ করছিলো।

চমকে উঠছিলো নূরী—এ তো কোন নারীর কোমল হাতের স্পর্শ নয়। ভয়ে সংকুচিত হয়ে সরে গিয়েছিলো নূরী মায়ারাণীর পাশ থেকে। হেসেছিলো মায়ারাণী!

নূরী ওর চোখ দু'টির দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠেছিলো, বুঝতে পেরেছিলো মায়ারাণী নারী নয়—পুরুষ।

এরপর থেকে নূরী সব সময় মায়ারাণীকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতো, ও এলেই বিব্রত বোধ করতো নূরী।

কিন্তু নূরী ভয়ে ভীত হবার মেয়ে নয়। সে দুর্দান্ত ভয়ংকর মেয়ে, নানা ছলনায় কৌশলে পালাবার পথ খুঁজতো কিন্তু মনিকে না নিয়ে যাবে না—এই তার শপথ।

একদিন গভীর রাতে নূরীর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো। শুনতে পেলো পাশে কোথাও নুপুরের শব্দ হচ্ছে। শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়লো নূরী, কুটিরের ঝাপ সরিয়ে উঁকি দিলো বাইরে। অবাক হয়ে দেখলো—একটা খাটিয়ার ওপরে বসে আছে একটা লোক, লোকটার হাতে চাবুক! সামনে নৃত্যরত একটি যুবতী। নৃত্যরত যুবতীর অনতিদূরে কয়েকটা মশাল জ্বলছে। মশালের আলোতে নূরী দেখলো, খাটিয়ায় বসা লোকটা যেন তার পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। কোথায় দেখেছে ভ্রূকুঁচকে ভাবতে লাগলো সে, হঠাৎ মনে পড়লো এ তো মায়ারাণীর মুখ। নূরীর চোখের সামনে লোকটার মুখ মিশে সেখানে ভেসে উঠলো। একটি অসাধারণ নারীমুখ। আজ সব পরিস্কার হয়ে গেলো নুরীর কাছে। তার ধারণা সত্যি মায়ারাণী আসলে নারী নয়, সে পুরুষ—বুঝতে পারলো নূরী।

আরও অবাক হলো নূরী—যুবতীকে মাঝে মাঝে লোকটা চাবুক দ্বারা আঘাত করছে। মেয়েটি মাটিতে পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠে নাচতে চেষ্টা করছে।

নূরীর সে রাতে আর ঘুম হলো না, কে এই মায়ারাণী বেশী শয়তান। নিশ্চয়ই লোকটা ভেলকিবাজি জানে—নইলে এক এক সময় এক এক রূপ সে ধরে কি করে! আর সব কিছুর এমন পরিবর্তনই বা করে কেমন করে মনে পড়লো প্রথম দিনের কথা, সন্ন্যাসী বাবাজীর নিষেধ সত্ত্বেও মনির সন্ধানে নূরী এসেছিলো পশ্চিম দিকে। হঠাৎ তার সামনে দেখতে পেয়েছিলো সুন্দর একটি ফুলের বাগান, কত রকমের ফুলের সমারোহ সে বাগানে। বিমুগ্ধ নূরী হঠাৎ একটা ফুল ছিঁড়ে ফেলে ছিলো ভুল করে, সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ধোঁয়া তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। তারপর একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব তার সমস্ত সত্তাকে লুপ্ত করে দিয়েছিলো তখন, দেখতে পেয়েছিলো তার চারপাশে যেন প্রকান্ড প্রকান্ড দেয়াল, কোনোদিকে পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছিলো না। কিন্তু তারপর আবার দেখেছিলো একটা অন্ধকার কক্ষে বন্দিনী সে। আজ দেখছে সে কক্ষও কোথায় উধাও হয়েছে। একটা কুটিরের মধ্যে আটক রয়েছে। নূরীর কাছে সব যেন কেমন ঘোলাটে হয়ে এসেছে। সে বুঝতে পেরেছে—নিশ্চয়ই যাদুর নাগপাশে তাকে বন্দী করা হয়েছে।

❑

শিশু মনির অবস্থা আরও দুর্বিষহ। তাকে একটা বৃদ্ধার নিকটে রাখা হয়েছে। শুধু মনিই নয়, আরও কয়েকজন শিশু বালককেও সেই বৃদ্ধা দেখাশোনা করে। মনিতো বৃদ্ধাকে দেখলেই ভয়ে কুঁকড়ে যায়, কাঁদতে শুরু করে সে। বৃদ্ধার চেহারা অতি ভয়ংকর আর বিশ্রী। নাকটা চ্যাপ্টা— মাথাটা মস্ত বড় মাথায় আধাপাকা মোটা মোটা একগাদা চুল। শরীরটা জমাট পাথরের খোদাই করা মূর্তির মত শক্ত। মাঝে মাঝে খড়িমাটির মত সাদা দাঁত বের করে কথা বলে। মনি কিছুতেই ওকে সহ্য করতে পারে না।

ওকে দেখলেই মনি প্রাণফাটা চীৎকার করে ওঠে, তবু বৃদ্ধা জোর করে ওকে কোলে তুলে নেয়, মিছামিছি আদর করতে চেষ্টা করে— দুধ-কলা খেতে দেয়। ছোট্ট মনি কিছুই বোঝে না, বৃদ্ধাকে দেখলে ভয়ে চুপসে যায় আর সেই মুহূর্তে হরশংকর এসে ডাকলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কোলে। হরশংকর মনিকে নানাভাবে যাদুর দ্বারা নিজের বশীভূত করে নিয়েছে যা বলে হরশংকর শিশু হলেও মনি তাই করে। মনিকে নিয়ে যাদুর খেলা দেখাতে গেলে দর্শক হয় বেশী। তার কারণ, মনি শিশু হলেও খেলা দেখিয়ে দর্শকদেরকে অবাক ও মুগ্ধ করে। তাছাড়া মনির অপূর্ব সুন্দর চেহারাও দর্শকগণকে মুগ্ধ করে। মনি হরশংকরের যাদু খেলায় লাকি হয়ে দাঁড়ালো।

গহন বনে নূরী ছটফট করলেও শান্তভাবে গোপনে সে এখানকার রহস্যজাল ভেদ করবার চেষ্টা করতে লাগলো। হরশংকরের মনোভাব সে বুঝে নিলো কিছুদিনের মধ্যেই! নূরী একদিন হরশংকরকে বললো—আপনার মনঃতুষ্টির জন্য আমি সব করতে পারি। আপনি পুরুষ তাও আমি জানি, কেন আমার কাছে আপনি নারীর রূপ ধরে আসেন?

হরশঙ্কর নূরীর কথায় আশ্চর্য হলো, তার এই নিখুঁত নারীর ছদ্মবেশেও এই যুবতী তাকে চিনতে পেরেছে শুনে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলো হরশঙ্কর। তারপর কি যেন ভেবে বললো—তোমার অদ্ভুত বুদ্ধিবল দেখে আমি খুশী হয়েছি সুন্দরী। সঙ্গে সঙ্গে নিজের শরীর থেকে নারীর পোশাক খুলে ছুড়ে ফেলে দিলো দূরে, তারপর নূরীর দিকে দু'হাত বাড়িয়ে বললো—সুন্দরী, তোমাকে আমি প্রথম দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু আমি নিজকে অতি কঠিনভাবে সংযত রেখে এতদিন শুধু তোমার অপূর্ব রূপসুধা পান করেই

এসেছি, তোমাকে স্পর্শ করিনি। এসো, আজ তুমি আমার বাহুবন্ধনে। এসো প্রেয়সী———

নূরী ভেতরে শিউরে উঠলেও মুখে হাসি টেনে বললো— তোমার বলিষ্ঠ দীর্ঘ চেহারা আমাকেও মুগ্ধ করেছে, কিন্তু আমার মনিকে না পেলে আমি কিছুতেই তোমাকে ——— কথা শেষ না করে মাথা নত করলো।

দুষ্ট যাদুকর ক্রুদ্ধ হলো, মনিকে সে মায়াজালের আবেষ্টনীতে স্মৃতিচ্যুত করে রেখেছে, কোনো রকমেই তাকে নূরীকে দেখানো সম্ভব নয়। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো সে—সুন্দরী, তোমার মনি নেই।

মনি নেই!

না।

কোথায় আমার মনি?

তার রূপ পালটে গেছে।

তার মানে?

মনি তোমাকে দেখলে আর চিনতে পারবে না বা তোমার নিকটে আসতে চাইবে না।

না না, তা হতে পারে না, মনিকে আমি চাই। এনে দাও, এনে দাও আমার মনিকে।

অসম্ভব! তুমি তাকে কোনোদিনই পাবে না।

আমি তোমাকে হত্যা করবো শয়তান! নূরী দু'হাতে হরশঙ্করের গলা টিপে ধরলো জোরে।

অতি সচ্ছ সহজভাবে হাসতে লাগলো হরশঙ্কর নূরীর হাত দু'খানা তার গলায় যেন পুষ্পহারের মত অনুভূত হলো। হরশঙ্কর ধরে ফেললো নূরীকে। নূরী ভীষণভাবে কামড়ে দিলো যাদুকরের হাতে। যাদুকর যন্ত্রণায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি অগ্নিবাণের মত নূরীর চোখে এসে লাগলো নূরী ধীরে ধীরে সংজ্ঞা হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো।

যাদুকর হরশঙ্কর হেসে উঠলো হাঃ হাঃ করে, তারপর কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো।

নূরীর যখন জ্ঞান ফিরলো তখনও সে মেঝেতেই পড়ে আছে। উঠে বসলো নূরী। বেরিয়ে এলো কুটিরের বাইরে, চারদিকে তাকিয়ে দেখলো— না কোথাও কেউ নেই। নূরী এগুলো সামনের দিকে। একি! চারপাশে বেড়াজাল কেন! বাধা পেলো নূরী। বেড়া পার হবার জন্য অনেক চেষ্টা করলো–কিন্তু কিছুতেই সক্ষম হলো না! নূরী জানে তাকে যাদুর বেড়াজালে আবদ্ধ করা হয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও সে বাইরে যেতে পারলো না। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো নূরী। হঠাৎ মনির কণ্ঠের শব্দ তার কানে

এলো। চমকে উঠলো নূরী, সামনে তাকাতেই দেখতে পেলো—বেড়ার একপাশে দাঁড়িয়ে মনি চোখ রগড়াচ্ছে।

নূরী মনিকে দেখামাত্র ছুটে গেলো তার দিকে, উচ্ছ্বসিতভাবে ডাকলো—মনি হাত বাড়ালো মনিকে কোলে নেবার জন্য। কিন্তু মনি নূরীর দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলো। বিস্মিত ব্যথিত নূরী, ডেকে উঠলো—মনি, মনি—মনি ফিরেও তাকালো না নূরীর দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা অট্টহাসির শব্দ ভেসে এলো পেছন থেকে—হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ---

চমকে ফিরে তাকালো নূরী, সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হলো সে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে বিকট স্বরে হাসছে হরশঙ্কর। মনি নূরীর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বলেই তার এই অদ্ভুত হাসি—হাসি যেন থামতে চায় না।

হরশঙ্কর বিদ্রূপের সুরে বললো –নাওনা তোমার মনিকে।

নূরী চিত্রাপিতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সামনে বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে মনি—এখনও মনি চোখ রগড়াচ্ছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

নূরী দু'হাত বাড়িয়ে কোলে নিতে গেলো—মনি কিছুতেই নূরীর কোলো এলো না-কেঁদে উঠলো সে চীৎকার করে। কাঁদতে লাগলো মনি হাত-পা ছুড়ে। হরশঙ্কর এগিয়ে এসে হাত বাড়াতেই মনি তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

দু'হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠলো নূরী।

হরশঙ্কর মনিকে নিয়ে ততক্ষণে চলে গেছে সেখান থেকে।

নূরীর মাথাটা কেমন যেন বনবন করে ঘুরে উঠলো। মাটিতে বসে পড়লো সে।

❑

নিজের কক্ষে বসে আপন মনে ডায়ারীর পাতা উল্টাছিলো জন। আজ ক'দিন অবিরত কক্ষের প্রতিটি কাগজপত্র আর বাক্স স্যুটকেস তন্ন তন্ন করে কিসের যেন অনুসন্ধান করছে সে। আজও তার চারপাশে স্তুপাকার কাগজপত্র। ঘরময় জিনিসপত্র ছাড়ানো মাঝখানে একটা চেয়ারে বসে ডায়রী দেখছিলো জন অতি নিপুণ দৃষ্টি মেলে ডায়রীর পাতায় দেখছিলো, এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে এ্যানি!

চমকে ফিরে তাকায় জন, এ্যানিকে দেখতে পেয়ে দ্রুত ডায়রীখানা লুকিয়ে ফেলে।

এ্যানি এসে বসলো জনের চেয়ারের হাতলে, দু'হাতে জনের কণ্ঠ বেষ্টন করে বলে—ডার্লিং তুমি সারাক্ষণ শুধু এ ঘরেই কাটাবে? তা ছাড়া এ কি হয়েছে তোমার ঘরের অবস্থা?

আর বলো না এ্যানি, বিশেষ দরকারী একটা জিনিস হারিয়ে ফেলেছি, খুঁজে পাচ্ছিনে।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ জনের কণ্ঠ ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসলো এ্যানি—আমার জিনিসটা হারাওনি তো?

মাথা চুলকায় মিঃ জন—আরে না না, ওটা ঠিক আছে।

এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে এ্যানি—উহ্, বাঁচালে জন! আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। একটু থেমে বললো এ্যানি–আমি কাউকেই বিশ্বাস করিনি জন, তাই ওটা আমি তোমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছি।

হাঁ এ্যানি , আমিও সেই কারণে ওটাকে খুব যত্ন করে রেখেছি।

তুমি লন্ডন যাবার সময় ওটাকে ঠিক করে রেখেছিলে তো?

কালো চশমার ফাঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো জন এ্যানির মুখে। একটু চিন্তা করে বললো—হাঁ, ওটা আমি নিরাপদ স্থানে রেখেই গিয়েছিলাম।

ডার্লিং, এবার তো আমরা সব কাজ শেষ করে ফিরে এসেছি। বিয়ের তারিখটা এবার ঠিক করে ফেলো, কেমন?

আমিও সেই কথাই ভাবছি এ্যানি, এবার আমাদের বিয়েটা শীঘ্র হওয়া দরকার।

ডালিং, আমার সত্যি বড় আনন্দ হচ্ছে! কিন্তু কবে সেই দিনটি আসবে প্রিয়?

এ্যানি জনের মুখের কাছে মুখখানা এগিয়ে এনে প্রশ্ন করলো। দক্ষিণ হাতে জনের চোখের কালো চশমা খুলে নিতে গেলো এ্যানি, জন তাড়াতাড়ি মুখটা সরিয়ে বললো—উঁহু।

না না, তোমার ঐ কালো চশমা খুলে ফেলো! তোমার চোখ দুটো আমাকে দেখতে দাও।

এ্যানি, চশমা খুললে আমি বড় অস্বস্তি বোধ করি, চশমা আমার সম্বল!

জন!

এ্যানি, আমাকে কি তোমার ভাল লাগছে না?

অতি উত্তম ------অতি মধুর ----- ডার্লিং তুমি এবার আমাকে ধরা দিচ্ছো না কেন? কেমন যেন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছো আমার কাছ থেকে?

এই তো আর ক'টা দিন, আমাদের শুভ বিবাহটা আগে হয়ে যাক, তখন আমরা দু'জন এক হয়ে যাবো, মিশে যাবো, দু'জন দু'জনার মধ্যে।

আমার বিলম্ব সইছে না ডালিং-----এ্যানি জনের বুকে মাথা রাখলো আগে কিন্তু তুমি এমন ছিলে না।

জন বিব্রত বোধ করলো, কিছু বলতে যাচ্ছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে জানালার শার্শীর ফাঁকে দু'খানা চোখ ভেসে উঠলো।

এ্যানি লক্ষ্য না করলেও জনের চোখে ধরা পড়ে গেলো। জন এ্যানির কানে ফিস ফিস করে বললো—এ্যানি, কেউ আমাদের লক্ষ্য করছে।

বলো কি! এ্যানি সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

জন উঠে গেলো জানালার দিকে, ইতিমধ্যে চোখ দু'টি অন্তর্ধান হয়েছে।

জন ফিরে এলো এ্যানির পাশে—এ্যানি, আমার পেছনে কেউ ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, সদাসর্বদা সে আমাকে অনুসরণ করছে।

ভীতকণ্ঠে বললো এ্যানি—আমার কিন্তু ভয় করছে।

ভয় পাবার যদিও তেমন কিছু নেই তবু সাবধানে থাকা নিতান্ত দরকার।

কি করবো জন?

এখন তুমি সব সময় নিজের ঘরে থাকবার চেষ্টা করবে। এমনকি আমার কক্ষেও আসবে না এ্যানি।

একি বলছো ডার্লিং!

হাঁ এ্যানি, আমিই যাবো তোমার ঘরে।

না গেলে আমি কিন্তু আনেক দুঃখ পাবো।

এ্যানি, তার চেয়ে আমিই বেশী দুঃখ পাবো তোমার পাশে না গেলে।

সত্যি!

সত্যি এ্যানি-----জন এ্যানির চিবুক খানা তুলে ধরলো—তাহলে তুমি এখন যাও, এ্যানি!

যাচ্ছি। তুমিও এখন শুয়ে পড়ো জন—হাতাঘড়িটা দেখে নেয় এ্যানি—রাত অনেক হয়ে গেছে।

এ্যানি বেরিয়ে যায়, হাই তোলে জন—তারপর দরজা বন্ধ করে এগিয়ে যায় জানালার শার্শীর পাশে খুলে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে নেয়। না কোথাও কেউ নেই! আবার ভাল ভাবে জানালার শার্শী বন্ধ করে ফিরে আসে চেয়ারের পাশে, অতি সন্তর্পণে প্যান্টের পকেট থেকে ডায়ারীখানা বের করে মেলে ধরলো চোখের সামনে। কিছুক্ষণ দৃষ্টি বুলিয়ে উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো, কালো চশমাটা খুলে রাখলো আপন মনে হেসে উঠলো হাঃ হাঃ করে। এবার দ্রুত অন্য একটি ড্রেস পরে নিলো জন। তারপর কালো চশমাটা পুনরায় পরে নিলো চোখে। দরজা খুলে সোজা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো। গাড়ী বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলো—জন গাড়ীতে উঠে ষ্টার্ট দিলো।

গভীর রাতের জনহীন পথ বেয়ে জনের নতুন নীল রঙের গাড়ীখানা দ্রুত এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে দু'একজন পথাচারী এদিক সেদিক চলে যাচ্ছিলো। ট্রাফিক্ক পুলিশ পথের মোড় থেকে বিদায় নিয়েছে অনেকক্ষণ।

আঁকাবাঁকা পথ ঘুরে ফিরে একটা অন্ধকার গলির মধ্যে এসে গাড়ী থামিয়ে নেমে পড়লো জন। রাস্তার ওপাশে একটা বহুদিনের পুরোন রঙচটা বাড়ী। বাড়ীর দরজায় একটা তালা লাগানো। জন সেই দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো—চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিলো, তারপর দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলো।

এগিয়ে চললো সামনের দিকে। পাশাপাশি সারিবদ্ধ কয়েক খানা পুরোন ইটের গাঁথুনি করা চুনবালি খসে পড়া ঘর। টানা বারান্দা বেয়ে জন শেষ কক্ষের নিকটে এসে থামলো, পুনরায় পেছনে তাকিয়ে দেখে নিলো অতি সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কক্ষটা অন্যান্য কক্ষের চেয়ে একটু বিশেষ ধরনের। এ দরজাতেও মস্ত একটা তালা লাগানো। তালা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলো সে। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো বাদুড় ও চামচিকে পাখি ঝাপটে এদিক থেকে সেদিকে উড়ে গেলো।

জন পকেট থেকে একটা ছোট টর্চ লাইট বের করে জ্বালালো—দেখতে পেলো, মেঝেতে একটা কাঠের বাক্স পড়ে রয়েছে। জন বাক্সটি সরিয়ে ফেলতেই একটা সুড়ঙ্গ পথ বেরিয়ে এলো।

জন সেই সুড়ঙ্গপথে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো। ভূগর্ভেও ওপরের মত পাশাপাশি কয়েকখানা কক্ষ। একটা কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে জন থমকে দাঁড়ালো, অদূরে দুগ্ধফেননিভ শুভ্র বিছানায় শায়িত এক যুবক। শরীরে মূল্যবান স্যুট। চীৎ হয়ে শুয়েছিলো সে—জনের পদশব্দে বিছানায় উঠে বসলো। ফিরে তাকাতেই জন বললো—গুড ইভনিং।

শয্যায় উপবিষ্ট যুবক কোনো কথা উচ্চারণ করলো না, একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বসলো। যুবকের চেহারা, সুন্দর, বলিষ্ঠ, দীপ্তময়, মাথায় কোঁকড়ানো একরাশ চুল, প্রশস্ত ললাটে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি মুখোভাব গম্ভীর উদাস।

জন যুবকের পাশে এসে বসলো—পিঠে হাত রেখে ডাকলো—বন্ধু, কেমন আছো?

এবারও কোনো জবাব দিলো না যুবক, মাথা নীচু করে নীরবে বসে রইলো।

শয্যার পাশেই একটা চৌকোনা টেবিল, টেবিলে নানা রকম ফলমূল সাজানো। জন একথোকা আঙ্গুর তুলে নিয়ে একটা ছিঁড়ে মুখে ফেললো, তারপর চিবুতে চিবুতে বললো—কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?

যুবক তবু নিরুত্তর । জন হেসে বললো—আর ক'টা দিন----কথার ফাঁকে চোখের কালো চশমা খুলে টেবিলে রাখলো।

যুবক তাকালো জনের মুখের দিকে।

হাসলো জন, তারপর পকেট থেকে একটা চেক বের করে বাড়িয়ে ধরলো—এখানে সই দাও বন্ধু।

না, আমি সই দেবো না।

তোমার একটা পয়সাও বাজে নষ্ট করবো না।

কি করবে তুমি এত টাকা?

সমস্ত হিসেব পাবে।

না, আমি কিছুতেই সই দেবো না।

দেবে না?

না!

জন প্যান্টের পকেট থেকে বের করলো একটা ছোট্ট রিভলবার চেপে ধরলো যুবকের বুকে—সই না দিলে আর কোনোদিন তুমি পৃথিবীর আলো দেখতে পাবে না বন্ধু!

যুবক ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো জনের মুখের দিকে। তারপর চোখ নামিয়ে তাকালো রিভলবারের দিকে, এবার ধীরে ধীরে জনের হাত থেকে পেনটা নিয়ে চেকে সই করলো সে।

চেকটা পকেটে ভাঁজ করে রেখে জন উঠে দাঁড়ালো—আবার দেখা হবে। গুডবাই!

জন রিভলবারখানা পকেটে রেখে দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

পথের পাশে গাড়ীখানা অপেক্ষা করছিলো, জন গাড়ীতে উঠে ষ্টার্ট দিলো।

নিজ বাড়ীর গাড়ী—বারান্দায় গাড়ী পৌঁছতেই জন লক্ষ্য করলো— তার হলঘরের দরজার ওপাশে কেউ যেন আত্মগোপন করলো—জন ঘরে প্রবেশ করে সুইচ টিপে আলো জ্বালালো। তারপর ওদিকের দরজা খুলে ধরলো—আসুন মিঃ লাহিড়ী।

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার থেকে সরে এলেন পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ লাহিড়ী। তাঁর মুখোভাব কিছুটা বিব্রত, হতভম্ভ।

জন হেসে বললো—নিশ্চয় আমার জন্য অপেক্ষা করছেন!

মিঃ লাহিড়ী কক্ষে প্রবেশ করে বললেন—হাঁ, মানে আপনার কাছে একটু দরকার ছিলো, তাই—

আসুন, আমি একটা কাজে বাইরে গিয়েছিলাম।

মিঃ লাহিড়ী আসন গ্রহণ করে বললেন—এত রাতে বাইরে আপনার কি এমন জরুরী কাজ ছিলো, মিঃ জন?

সব কথাই তো বলা যায় না, তবে আপনাকে বলা উচিত মনে করি।

বলুন?

আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু আজ পনেরো—বিশদিন হলো অসুস্থ্ হয়ে পড়েছে, তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

ওঃ—মিঃ লাহিড়ী একটা শব্দ করলেন!

এবার জন নিজের সিগারেট কেসটা মিঃ লাহিড়ীর সামনে বাড়িয়ে ধরে বললো—নিন।

মিঃ লাহিড়ী একটা সিগারেট তুলে নিতে নিতে বললেন—এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করা আমার উচিত হলো না মিঃ জন!

না না, পুলিশের লোকের আবার সময় অসময় আছে নাকি! যখনই আপনি প্রয়োজন বোধ করবেন তখনই অনুগ্রহ করে আসবেন খুশী হবো।

ধন্যবাদ মিঃ জন।

জন একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বললো–মিঃ লাহিড়ী মিস মালতী হত্যারহস্য উদঘাটনে কতদূর অগ্রসর হয়েছেন, জানতে পারি কি?

না, তেমন বেশী এগুতে পারিনি। তবে হাঁ, খুব শিগগির মালতী হত্যারহস্য উদঘাটিত হবে এটা সুনিশ্চয়!

অরুণ বাবু এখনও হাজতে আছেন?

হাঁ, অরুণ বাবু এখনও হাজতে।

কেন, কেউ কি তাকে জামিনে মুক্ত করে নেয়নি? মিঃ বাসুদেবও কি তার জামিনের আবেদন করেননি?

না, তিনি মিস মালতী হত্যার পর কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেছেন। হাজার হলেও কন্যার মৃত্যুশোক কম নয়, বৃদ্ধ বয়সে এমন একটা অঘটন তাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে।

আচ্ছা মিঃ লাহিড়ী, আমি একবার অরুণ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই, কয়েকটা প্রশ্ন করবো!

স্বাচ্ছন্দে মিঃ জন!

ধন্যবাদ।

মিঃ লাহিড়ী এবার মাথা চুলকান, তারপর বলেন—মিঃ জন, আপনি আমার একটা প্রশ্নের ঠিক জবাব দেবেন?

নিশ্চয়ই, বলুন?

আচ্ছা মিঃ জন, মিস মালতীর সংগে আপনার কেমন সম্বন্ধ ছিলো? অবশ্য এ প্রশ্ন আমি আগেও আপনাকে করেছি, পুনরায় করছি!

হাঁ, করবেন, একবার কেনো প্রয়োজনে দশবার করবেন। তার সঙ্গে আমার বান্ধবীর সম্বন্ধ ছিলো।

আপনি তাকে গভীরভাবে ভালবাসেননি?

না। বাসলে আমি এ্যানিকে বিয়ে করবার পাকা কথা দিতে পারতাম না।

এবার আপনি লন্ডন থেকে ফিরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি কেন?

এ্যানিকে বিয়ে করবার পাকা কথা দিয়ে অন্য একজন যুবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমার বিবেকে বেধেছে।

সে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলো—একথা সত্য?

হাঁ সত্য।

সেদিন আপনি তাকে সরাইখানায় পৌঁছে দিয়ে আসেননি?

না, সে নিজেই—একটু থেমে বললো জন—আমি তাকে পৌছে দিয়েছিলাম, কিন্তু সরাইখানায় নয়–তার নিজ বাড়ীতে।

তখন কি অরুণ বাবু বাড়ীতে ছিলো?

না, কেউ ছিলো না!

মিস মালতীকে আপনি কি বাড়ীর ভেতরে পৌছে দিয়েছিলেন না বাড়ীর সদর দরজা থেকেই বিদায় নিয়েছিলেন।

জন নিশ্চুপ হয়ে কি যেন ভাবলো, তারপর বললো—মালতী আমাকে ছেড়ে দেয়নি, আমি তার সংগে তার কক্ষে গিয়েছিলাম।

কতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন আপনি সেখানে?

মিনিট পনেরো-----কিন্তু-----আপনি কি আমাকে সন্দেহ করছেন মিঃ লাহিড়ী?

আমরা পুলিশের লোক—সন্দেহ করা আমার স্বভাব। মিঃ জন, আজ আমি চললাম, কাল আপনি থানায় আসবেন?

হাঁ, আমাকে যেতে হবে একটু, কারণ অরুণ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার একান্ত প্রয়োজন।

চলি? উঠে পড়লেন মিঃ লাহিড়ী।

জন নিজের কামরায় গিয়ে দরজা বন্ধ করলো। বার দুই হাই তুলে হাতঘড়ির দিকে তাকালো তারপর একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো। প্যান্টের পকেট থেকে ডায়রীখানা বের করে মেলে ধরলো চোখের সামনে।

হঠাৎ একসময় জনের চোখ উজ্জল হয়ে উঠলো। ডায়রীর পাতায় এক জায়গায় বারবার পড়তে লাগলো সে। তারপর ডায়রীখানা পকেটে রেখে কিছুক্ষণ ধীর পদক্ষেপে কক্ষে পায়চারী করলো। তার মুখোভাব স্বচ্ছ দীপ্তময়, একটা পাষাণভার যেন তার বুক থেকে নেমে গেছে বলে মনে হলো। ঠোঁটের কোণে একটা তীক্ষ্ণ হাসির রেখা ফুটে উঠেছে।

এবার শয্যায় গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো জন, অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়লো সে।

বেলা হয়ে গেছে অনেক—এখনও জনের ঘুম ভাঙলো না! অঘোরে ঘুমাচ্ছে সে। কক্ষে প্রবেশ করলো এ্যানি। খাবার টেবিলে বসে চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তবু জনের সাক্ষাত না পেয়ে এ্যানি চলে এলো জনের কক্ষে।

জন পাশের টেবিলে তার কালো চশমাটা খুলে রেখে উবু হয়ে শুয়ে ছিলো বালিশটা আঁকড়ে ধরে।

এ্যানি গিয়ে বসলো জনের পাশে, পিঠে হাত রেখে ডাকলো—ডার্লিং, এত ঘুমাচ্ছো! ওঠো!

জনের ঘুম ভেঙে গেলো আচম্বিতে কিন্তু সে নিশ্চুপ ঘুমের ভান করে শুয়েই রইলো। এ্যানি মাথাটা রাখলো জনের পিঠের ওপর—ওঠো, ডালিং!

উ হুঁ, শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে।

এ্যানি তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসে জনকে টেনে এদিক করতে গেলো কিন্তু জন কিছুতেই পাশ ফিরলো না, বললো এবার—এ্যানি, প্রিয়ে, আর একটু ঘুমোতে দাও।

অনেক বেলা হয়েছে, ছিঃ এত ঘুমায় না!

এ্যানি!

বলো?

লক্ষ্মীটি, আমাকে আর একটু ঘুমাতে দাও।

বেশ আমি যাচ্ছি। যাবার সময় টেবিল থেকে কালো চশমাটা কাপড়ের নীচে লুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

জন এবার পাশ ফিরে হাত বাড়ালো টেবিলে চশমাটার জন্য কিন্তু একি? চশমা কোথায়? জন বিপদে পড়লো। তাড়াতাড়ি বাথরুমে প্রবেশ করে ড্রেসিং আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো, চোখটা তার এখনও সম্পূর্ণ সারেনি।

বাসুদেব সরাইখানার দোতলার একটা কক্ষে থাকতেন; এটাই তাঁর বিশ্রামকক্ষ। মাঝে মাঝে কন্যা মালতীর বাড়ী বেড়াতে যেতেন কিংবা কখনও তাকে রাখতে যেতেন বাসুদেব স্বয়ং। কিন্তু মালতী নিহত হবার পর আর বাসুদেব মালতীর শূন্য বাড়ীতে যাননি। কন্যার শেষ নিঃশ্বাস যে বাড়ীর হাওয়ায় মিশে রয়েছে, যে বাড়ীর শুষ্ক মেঝে তার কন্যার বুকের রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছিলো, সে বাড়ী তাঁর কাছে অসহ্য।

আজকাল বাসুদেব সব সময় তার নিজের ঘরেই থাকেন। কখনও বিশেষ প্রয়োজনে এসে বসেন তিনি সরাইখানার গদিতে।

ভাবগম্ভীর প্রবীণ ব্যক্তি বাসুদেব কন্যার মৃত্যুতে সত্যিই একেবারে মুষড়ে পড়েছেন। পুলিশ অফিসারগণ আসনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, যেটুকু না বললে নয় তাই তিনি বলেন।

সেদিন অনেক রাতে বাসুদেব বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিলেন। সরাইখানা সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যায়নি, নীচে খানাপিনা নাচ গান তখনও চলছে।

হঠাৎ বাসুদেবের জানালার শার্শী খুলে কক্ষে প্রবেশ করলো জন, দক্ষিণ হাতে তার উদ্যত রিভলবার।

বাসুদেব পদশব্দে মুখ ফেরাতেই চমকে উঠলেন, অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—জন, তুমি!

দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এলো জন—হাঁ আমি, চিনতে তাহলে ভুল হয়নি মিঃ দেব?

সাত বছর পর তোমাকে দেখলাম কিন্তু কি কারণে তুমি এখানে এসেছো?

একটা জরুরী কাজে।

তা সামনে দিয়ে না এসে পেছনের জানালা দিয়ে কেন?

বহুদিন পর কিনা সরাইখানার সবাই আমাকে দেখলে অবাক হবে—তাই আত্মগোপন করে এলাম।

কিন্তু ওটা কেন তোমার হাতে? জনের হাতের রিভলবারখানা দেখান বাসুদেব।

হাসে জন—যে প্রশ্ন করবো সঠিক জবাব না দিলে এটার দরকার হতে পারে!

বাসুদেবের মুখমন্ডল ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠলো, আমতা আমতা করে বললেন—কি এমন প্রশ্ন করবে জন?

আপনার কন্যা সম্বন্ধে দু'চারটা কথা।

সে জন্য রিভলবার দেখাতে হবে না জন। মালতীর সম্বন্ধে তুমি যা জিজ্ঞাসা করবে তাই বলবো, মা মালতী আমাকে শোকসাগরে ভাসিয়ে রেখে গেছে। রুমালে চোখ মোছেন বাসুদেব।

সত্যই বাসুদেব কন্যাকে হারিয়ে উন্মাদের মত হয়ে পড়েছেন। একমাত্র কন্যা ছিলো তাঁর সম্বল।

জন বললো—আমি যখন লন্ডন যাই তখন আপনার কন্যা মিস মালতীর নিকটে আমার একছড়া হীরার হার রেখে যাই, সেটার জন্য আজ আমি এসেছি।

বিস্ময়ভরা কন্ঠে বলে ওঠেন বাসুদেব—হীরার হার!

হাঁ, পাঁচখানা হীরার খন্ড সেই হারে গাঁথা ছিলো।

একটু চিন্তা করে বললেন বাসুদেব—হাঁ, আমি সেই রকম এক ছড়া হার তার গলায় দেখেছিলাম। আমি তাকে সেই হার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সে বলেছিলো তোমার কথা—তুমি নাকি তাকে ওটা উপহার দিয়েছো।

দিয়েছিলাম, কিন্তু আজ সে নেই—কাজেই ওটা আমি ফেরত নিতে এসেছি।

বাসুদেবের চোখ দুটোতে ক্রুদ্ধ ভাব ফুটে উঠলো, বললেন—সে হারের কথা আমি জানিনা। হারের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করলে আমি তার জবাব দিতেও রাজী নই।

জন রিভলবারখানা একবার ঘুরিয়ে নিলো হাতের মধ্যে। কক্ষের স্বল্পালোকে রিভলবারখানা চকচক করে উঠলো।

বাসুদেব ঢোক গিলে বললেন—সে নিহত হবার পর হারের সন্ধান আমি জানি না।

জন হাসলো—জানেন না, কিন্তু মালতী নিহত হওয়ার সময়ও সেই হার তার গলায় ছিলো মিঃ দেব।

এ কথা তুমি কি করে জানলে জন? নিশ্চয় তুমি তাকে হত্যা করেছো?

সেই কথা জানাতেই আমি এসেছি মিঃ দেব।

কি, এত সাহস তোমার। মালতীকে তুমিই তাহলে হত্যা করেছো?

হত্যা করিনি, কিন্তু মালতীকে যখন হত্যা করা হয় তখন আমি সেখানেই ছিলাম।

বাসুদেবের মুখমন্ডল কালো হয়ে উঠলো—আমার কন্যার হত্যাকান্ডে তুমি ছিলে সেখানে অথচ হত্যাকারীকে তুমি——

হাঁ, আমিই তাকে পালাবার সুযোগ দিয়েছি।

কেন? কেন?

হারছড়া পরে তার কাছে পাবো এই আশায়।

তাহলে আমার কক্ষে কেন এসেছো জন?

হারছড়া এখন আপনার কক্ষেই আছে কিনা——

না না, আমার কক্ষে কেন সেই হার থাকবে। জন, তুমি ভুল করছো। আমার কন্যাকে আমি হারিয়েছি, তার চেয়ে কোনো জিনিসই আমার কাছে মূল্যবান নয়।

এমন সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ শোনা গেলো। জন একবার দরজার দিকে তাকিয়ে দ্রুত যে পথে এসেছিলো সেই পথে প্রস্থান করলো।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন বাসুদেব শর্মা।

কক্ষে প্রবেশ করলেন মিঃ লাহিড়ী ও দু'জন পুলিশ। পেছনে হোটেলের ম্যানেজার রজতবাবু।

রজতবাবু বললেন—এই কিছুক্ষণ আগেও কেউ ছিলো।

মিঃ লাহিড়ী বললেন—বাসুদেব বাবু, এখানে কেউ এসে ছিলো?

হাঁ, এই মুহূর্তে মালতীর হত্যাকারী এখানে এসে আমাকে হত্যা করতে যাচ্ছিলো।

হোয়াট?

হাঁ, ইন্সপেক্টার আর একটু হলেই আমার মৃতদেহ আপনারা দেখতে পেতেন।

এসব কি বলছেন মিঃ শর্মা!

হাঁ, সব সত্য। ইন্সপেক্টার মালতীর হত্যাকারী আর কেউ নয়—জন—জনই তাকে হত্যা করেছে।

জন!

হাঁ, ইন্সপেক্টার! জনই আমার কন্যাকে হত্যা করেছে।

মিঃ লাহিড়ীর মুখমন্ডল কুঞ্চিত হয়ে এলো, তিনি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললেন—জন মালতীর হত্যাকারী একথা আপনাকে কে বললো? সে নিজেই কি বলেছে?

না নিজে বলেনি, নিজে কেউ বলেওনা।

তবে?

তার কথাবার্তায় প্রকাশ পেয়েছে।

কি রকম?

প্রথমতঃ জন আমার পরিচিত লোক, সে গোপনে পেছনের জানালা দিয়ে আমার কক্ষে প্রবেশ করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ জনের হাতে গুলীভরা রিভলবার ছিলো। তৃতীয়তঃ জন নাকি মালতীকে একছড়া হীরার হার উপহার দিয়েছিলো। সে হার ছিলো অত্যন্ত মূল্যবান। সে ঐ হার পুনরায় নিতে এখানে এসেছিলো! হার আমার নিকেট না পাওয়ায় সে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়।

তারপর?

জন বলে, মালতীকে যখন হত্যা করা হয় তখন সে নাকি সেই স্থানে উপস্থিত ছিলো।

একথা সে নিজে স্বীকার করেছে?

হাঁ করেছে।

এটাই কি আপনার জনকে মালতীর হত্যাকারী বলে সন্দেহ হওয়ার কারণ?

এছাড়াও জনের সবকিছুই আমার কাছে বেশ রহস্যজনক বলে মনে হলো ইন্সপেক্টার।

রজতবাবু বললেন—জন তাহলে সরাইখানার সম্মুখভাগ দিয়ে না এসে পেছনের শার্সী খুলে এসেছিলো কেন?

হাঁ, সবতো শুনলেন। বললেন বাসুদেব।

এমন সময় কাফ্রি চাকরটা হাঁপাতে হাপাতে এসে বললো— হুজুর হুজুর,--- একটা লোক সরাইখানার পেছনে দাঁড়িয়েছিলো আমি তাকে দেখে ফেলায় সে ছুটে পালিয়ে গেলো।

মিঃ লাহিড়ী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন—পালিয়ে গেলো!

হা, স্যার,কোট-প্যান্ট পরা একটা সাহেবের মত লোক। এখনও সে বেশী দূর যেতে পারেনি হুজুর-------

মিঃ লাহিড়ী প্রশ্ন করলেন— কোন্ দিকে গেছে বলতে পারো?

নিশ্চয়ই পারি। দক্ষিণ দিকে গেছে লোকটা।

মিঃ লাহিড়ী আর বিলম্ব না করে দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

বাসুদেব এতক্ষণে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। একে কন্যাশোকে তিনি মুহ্যমান, তার ওপর এসব উপদ্রব তাঁর মনটাকে একেবারে যেন ছেচে দিয়েছে!

মিঃ লাহিড়ী অনেক সন্ধান করেও জন বা অন্য কাউকে সরাইখানার আশেপাশে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখলেন না।

অফিসে ফিরতেই মিঃ রায় জানালেন—মিঃ লাহিড়ী, মিঃ জন আপনার সাক্ষাৎ কামনায় বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন।

বিস্মিত হলেন মিঃ লাহিড়ী—তিনি এইমাত্র বাসুদেবের মুখে শুনে এলেন—জন নাকি একটু আগেই তার ওখানে হামলা দিয়েছিলো। অবাক হলেও তিনি কথাটা প্রকাশ করলেন না। জনকে লক্ষ্য করে বললেন—হ্যালো মিঃ জন, আমি একটু বাইরে কাজে গিয়েছিলাম।

জন গম্ভীর মুখে বললো—যাক, এসেছেন ভালই হলো—আমি অরুণ বাবুর সঙ্গে একটু সাক্ষাৎ করতে চাই।

আসুন মিঃ জন!

জনকে নিয়ে মিঃ লাহিড়ী হাজত কক্ষে এলেন।

জন অরুণ বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে। লম্বা ছিপছিপে গঠন, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, গায়ের রঙ ফর্সা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি—বেশ ক'দিন শেভ করা হয়নি। চোখ দুটোতে করুণ চাউনি।

মিঃলাহিড়ী বললেন—আপনার যা বলবার তাড়াতড়ি বলে নিন মিঃ জন।

ইয়েস! আমি সামান্য ক'টি কথা ওকে জিজ্ঞাসা করবো। অরুণ বাবুকে লক্ষ্য করে বললো জন—অরুণ বাবু, আপনার সঙ্গে তেমন করে আমার পরিচয় নেই। আমি মিস মালতীর পুরোনো বন্ধু জন।

অরুণ বাবু অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো—আপনি জন!

হাঁ আমি জন। দেখুন আপনাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করবো। আপনি যদি সঠিক জবাব দেন তাহলে মালতীর হত্যা রসহস্য উদ্‌ঘাটন হবে আপনি যদি সত্যই নির্দোষ হন তাহলে আপনার মুক্তির পথও পরিস্কার হবে।

বলুন। আগ্রহভরাদৃষ্টি নিয়ে তাকালো অরুণ বাবু মিঃ জনের মুখের দিকে।

জন একবার মিঃ লাহিড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললো—আচ্ছা মিঃ অরুণ বাবু, মিস মালতীর সঙ্গে আপনার কত দিনের পরিচয়?

একটু ভেবে নিয়ে বললো অরুণবাবু—বছর তিন হবে।

তার সঙ্গে আপনার কেমন সম্বন্ধ ছিলো? লজ্জা বা সংকোচ করবেন না, যদিও মিস মালতী আমারও বান্ধবী ছিলো।

না না, তা করবো না।

বলুন তবে!

মালতীকে আমি ভালবাসতাম।

শুধু কি ভালবাসতেন, না তার সঙ্গে অন্য কোনো রকম সম্পর্ক --- মানে আপনাকে প্রথমেই বলেছি কোনো রকম দ্বিধা করবেন না আমার কাছে।

হাঁ, মালতী বলেছিলো সে আমাকে বিয়ে করবে এবং সে কারণেই আমি তাকে ভালবাসতাম ও তার বাড়ীতে থাকতে রাজী হয়েছিলাম।

জন আর একবার মিঃ লাহিড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো।

মিঃ লাহিড়ীও অরুণবাবুর কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনে যাচ্ছিলেন।

জন বললো—শুধু কি মিস মালতীর কথাতেই আপনি তার বাসায় থাকতে রাজী হয়েছিলেন?

না, তার বাবা বাসুদেবও আমাকে ওখানে থাকবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

আপনি কি একাই মালতীর বাড়ীতে থাকতেন?

না, একটা কাফ্রি চাকরও থাকতো। সে নিচের তলায় ঘুমাতো।

আর আপনি?

আমি—আমি— একটু ইতস্ততঃ করে বললো অরুণ বাবু—আমি মালতীর পাশের কামরায় থাকতাম। তবে আমাকে প্রায় রাতেই বাইরে কাটাতে হতো।

কেন?

বাসুদেব নানা কাজে আমাকে বাইরে পাঠাতেন।

তখন মালতীর কাছে, মানে ঐ বাসায় কে থাকতো?

ঐ কাফ্রি চাকরটা। আমি কোনো কোনো দিন রাতে ফিরে আসতাম।

জন কি যেন ভাবলো, তারপর বললো—মিঃ লাহিড়ী আপনি মনোযোগ সহকারে এর কথাগুলো শুনে যাবেন।

হাঁ, মিঃ জন আমি আপনাদের উভয়ের কথা বার্তাই অতি মনোযোগ সহকারে শুনে যাচ্ছি।

ধন্যবাদ মিঃ লাহিড়ী! পুনরায় ফিরে তাকায় জন অরুণ বাবু মুখের দিকে—আচ্ছা অরুণ বাবু?

বলুন?

মিস মালতী সরাইখানা থেকে কত রাতে বাসায় ফিরতো?

তার কোন ঠিক সময় ছিলোনা। কারণ সে কোনো কোনো রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত সরাইখানায় কাটাতো।

শুধু কি নাচ গানের জন্যই সরাইখানায় তাকে অত রাত পর্যন্ত রাখতো তার বাবা বাসুদেব?

অরুণবাবু মাথা নত করলো, কোনো জবাব দিলো না?

জন ও মিঃ লাহিড়ী দৃষ্টি বিনিময় করলো। উভয়ের মুখেই মৃদু হাসির আভাস ফুটে উঠে মিলিয়ে গেলো।

মিঃ লাহিড়ী বললেন—অর্থের লোভে মানুষ কতদূর নীচ হতে পারে! আপন কন্যাকে—ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

জন মিঃ লাহিড়ীর কথার কোনো জবাব না দিয়ে অরুণ বাবু বললো—এসব জেনেও আপনি মালতীকে বিয়ে করতে রাজী ছিলেন?

অরুণ বাবু কোনো জবাব না দিয়ে একবার মিঃ জনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো। পুনরায় দৃষ্টি নত করে সে।

মিঃ লাহিড়ী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—উনি যা প্রশ্ন করছেন তার জবাব দিন অরুণবাবু। লজ্জার স্থান এটা নয়।

অরুণ বাবু পুনরায় চোখ তুললো।

জন বললো—মালতীর চরিত্রহীনতার কথা জেনেও আপনি তাকে ভালবাসতেন?

হাঁ, ওকে আমার ভাল লাগতো।

সেটা কি ওর অর্থ, না ওকে?

ওকে।

তাই বুঝি কোনো ঘৃণা ছিলো না ওর ওপর?

হাঁ, যাকে ভালবাসা যায় তাকে ঘৃণা করা যায় না।

অদ্ভূত মানুষ আপনি অরুণবাবু। একটু হেসে বললো জন—আমিও একদিন মালতীকে গভীরভাবে ভালবাসতাম, সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসতাম। আমার ভাবী স্ত্রী মিস এ্যানি আমার নিকটে একটা হীরার হার গচ্ছিত রেখে লন্ডন গিয়েছিলো ওর বাবার সঙ্গে। মিস মালতীর সঙ্গে আমার যখন ভালবাসা গভীরভাবে জমে ওঠে তখন আমি এ্যানির সেই গচ্ছিত হীরার হার তাকে উপহার দেই।

তারপর একদিন লন্ডন থেকে আমার ডাক এলো। চলে গেলাম। যবার সময় মালতী আমাকে অনেক কথাই বলেছিলো। সে বলেছিলো জন তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি তোমার প্রতীক্ষা করবো যদিও তুমি অন্য মেয়েকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তবু আমি তোমাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসি ও চিরদিন বাসবো। কিন্তু আমি লন্ডন থেকে ফিরে জানতে পারলাম—সে তার পিতার সরাইখানার নাচনে ওয়ালী হয়েছে। কন্যার যৌবন বিক্রি করে বাসুদেব অর্থ উপার্জন করছে। কথাটা শোনার পর আমার সমস্ত মন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো, আমি আর মালতীর পাশে যেতে পারিনি অবশ্য সেই একদিন এসেছিলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। হাঁ, আমি শেষ পর্যন্ত তাকে তার বাড়ীতে পৌছে দিয়েও এসেছিলাম— কিন্তু আগের মত সচ্ছ মন নিয়ে তাকে আর ভালবাসতে পারিনি।

মিঃ লাহিড়ী হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন—আপনার ভাবী স্ত্রীর গচ্ছিত সেই মূল্যবান হীরার হার কি মিস মালতীর নিকটেই রয়ে গেলো?

হাঁ, ওটা আমি আর ফেরত নিতে পারলাম না।

মিঃ লাহিড়ী সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন জনের মুখের দিকে।

জন অরুণ বাবুকে প্রশ্ন করলেন—অরুণ বাবু, ঠিক করে বলুন দেখি, আপনি সেই হীরার হার দেখেছিলেন?

হাঁ দেখেছিলাম, এমন কি মৃত্যুর দিনও ঐ হার তার গলায় ছিলো।

মিঃ লাহিড়ী বললেন—কিন্তু কি আশ্চর্য কই মৃত্যুকালে তার কণ্ঠে তো কোনো হার ছিলো না। তবে পোষ্টমর্টেম রিপোর্টে জানা গেছে মিস মালতীর গলায় একটা আঁচড়ের চিহ্ন ছিলো।

সেই চিহ্নই হলো মিস মালতীর নিহতের কারণ।

তাহলে কি ঐ হারছড়া-------

হাঁ ইন্সপেক্টার, ঐ হারছড়াই মালতীর মৃত্যু ঘটিয়েছে।

কঠিন হয়ে উঠলো মিঃ লাহিড়ীর মুখমন্ডল—এ হার আপনিই তাকে দিয়েছিলেন?

সে কথা তো বলেছি। এ সন্দেহ মিথ্যে নয় ইন্সপেক্টার। আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না যে আপনি এতদিনও আমাকে এরেষ্ট না করে নিশ্চপ আছেন। একটু থেমে বললো জন—আমি হার নিলে তাকে হত্যা করতে হতো না, আমার বাসায় যখন সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলো তখন তার কণ্ঠে হার ছিলো কিন্তু আমি অতখানি নীচ হতে পারিনি। যাক, একথা মুখে বলে বিশ্বাস করানো বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়।

আচ্ছা অরুণবাবু হারটা কি মালতী সব সময় পরতো?

না, কোনো কোনো বিশেষ দিন ছাড়া ঐ হার সে পরতো না এবং হারছড়া সে অতি সাবধানে ব্যাঙ্কে রেখে আসতো, এমনকি কোনোদিন রাতে ঐ হার নিজের বাসায় রাখতো না।

কেন, তার বাবা বাসুদেবকেও সে বিশ্বাস করতো না কি?

না না, সে কথা নয়। মালতী ঐ মূল্যবান হারছড়া বাসায় বা সরাইখানায় রাখা নিরাপদ মনে করতো না। যদিও অনেক সময় বাসুদেব বলেছেন–হারছড়া তাঁর কাছে রাখলে কোনো ভয় নেই চুরি যাবার।

হুঁ, মিস মালতীর এত সাবধানতা সত্ত্বেও একবার হারছড়া চুরি গিয়েছিলো না অরুণবাবু?

হাঁ গিয়েছিলো।

কিছুক্ষণ পর পুনরায় ফেরত পায় তাই না?

এ কথা আপনি কি করে জানলেন?

আরও জানি—সেইদিনই মালতী নিহত হয়।

আপনি-------আপনি-----

আমি সব জানি!

মুহুর্তে অরুণ বাবুর মুখমন্ডল ফ্যাকাশে হয়ে যায়। মিঃ লাহিড়ীর মুখে ভাবও বেশ ভাবাপন্না হয়ে ওঠে। ভ্রূ-কুঞ্চিত করে তাকান জনের মুখের দিকে।

জন বলে ওঠে—চলুন মিঃ লাহিড়ী। অরুণ বাবুর কাছে আমার যা জানবার ছিলো জানা হয়ে গেছে।

পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ লাহিড়ী ও জন হাজত কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো বাইরে।

জন বললো—মিস মালতীর পোষ্টমর্টেম রিপোটখানা একটু দেখতে চাই।

মুখোভাব পূর্বের ন্যায় গম্ভীর করে বললেন মিঃ লাহিড়ী—আচ্ছা চলুন।

পুলিশ অফিস থেকে জন যখন ফিরলো তখন ভোর হয়ে গেছে। সূর্যের আলোয় ঝকমক করছে গোটা পৃথিবী।

❏

হরশঙ্কর আজকাল নূরীকে নাচ শিক্ষা দিচ্ছে। তার কথামত নাচতে না পারলে চাবুকের আঘাতে জর্জরিত করে তোলে তাকে। নানাভাবে যন্ত্রণা অর কষ্ট দেয়া হয়। অন্যান্য মেয়ের চেয়ে নূরী অনেক সুন্দরী, নূরীকে নাচিয়ে হরশঙ্কর বেশী পয়সা উপার্জন করবে—তাই ওকে মেরেপিটে সুন্দরভাবে নতুন নতুন নাচ শেখাচ্ছে।

নূরীর নাচ শিক্ষা চলছে—আর মনিকে নিয়ে দেখানো হচ্ছে নানা রকম যাদুখেলা। মনিকে নিয়ে শহরে শহরে যায় হরশঙ্কর বহু দূরদেশেও চলে যায়। নৌকা-ষ্টিমারে জাহাজে। কখনও ট্রেনে বা প্লেনেও যায় হরশঙ্কর। সে তো আর সাধারণ যাদু খেলোয়াড় নয়। তার খেলা অতি ভয়ঙ্কর, অতি সাংঘাতিক। পয়সাও পায় সে প্রচুর। দেশ হতে দেশান্তরে তার বিচরণ। হরশঙ্করের অসাধ্য কোনো কাজ নেই। যে যুবক বা যুবতীর সাথে একবার নিভৃতে তার দেখা হয়েছে তাকেই সে মায়াজালের আবেষ্টনীতে আবদ্ধ করে ফেলেছে। বহু বালক-যুবতী-শিশুকে সে ফুসলিয়ে নিয়ে এসে অন্য জায়গায় বিক্রি করে মোটা পয়সা পেয়েছে। যাকে সে বাধ্য করতে পেরেছে বা যাকে দিয়ে পয়সা উপার্জন করা যাবে বলে মনে করেছে তাকে রেখে দিয়েছে নিজের যাদুর প্রাচীরে ঘেরা গহন বনের মধ্যে। যেখানে সাধারণ লোক বা জীবজন্তু প্রবেশে সক্ষম নয়।

দিন যায়। নূরী সুন্দরভাবে নাচ শিখে ফেলে, অদ্ভূত সে নাচ। সাধারণ নারীর পক্ষে সে ধরনের নাচ অসম্ভব।

হরশংকর একদিন মনিকে সঙ্গে করে প্লেনযোগে রওয়ানা দিলো দূরদেশে। আরাকান, হাবলুন হয়ে একদিন কান্দাই শহরে পৌছলো হরশংকর আর মনি। অবশ্য সঙ্গে তাদের আরও কয়েকজন লোক ছিলো-এরা হরশংকরের সঙ্গী বা সাথী।

কান্দাই-এ হই হই রই রই পড়ে গেলো, বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর হরশঙ্কর যাদুর খেলা দেখাতে এসেছেন কান্দাই শহরে।

শহরের সেরা থিয়েটার হলে হরশংকর তার খেলা দেখাবেন। বেলা চারটা থেকে টিকিট বিক্রি হচ্ছে। হল লোকে লোকারণ্য।

সন্ধ্যার পর খেলা শুরু হবে।

সংবাদটা একসময় চৌধুরীবাড়ীতেও গিয়ে পৌঁছলো। নকীব একটা বিজ্ঞাপন নিয়ে হাজির হলো মরিয়ম বেগমের সামনে—আম্মা, কান্দাই এ একজন খুব নামকরা যাদুকর এসেছে। সে নাকি অনেক অদ্ভূত খেলা দেখায়। একটা ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে এসেছে যাদুকর। এই দেখো বাচ্চাটার ছবিও রয়েছে বিজ্ঞাপনে। ছেলেটা বাঘের সঙ্গে লড়াই করবে।

মরিয়ম বেগম বিজ্ঞাপনটা হাতে নিয়ে দেখলেন। সেই যে বনহুর বলে যাবার পর থেকে মনমরা হয়ে গেছেন, দুনিয়ার কোনো কিছুই তিনি মন প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন না। মনিরার অবস্থাও মরিয়ম বেগমের চেয়ে কম নয় কিন্তু তবু সে মনটাকে শক্ত করে নিয়েছিলো, মামীমাও ভেঙ্গে পড়েছেন, সেও যদি মুষড়ে পড়ে তাহলে চলবে কি করে। তার মন বলছে বনহুর বেঁচে আছে, একদিন ফিরে সে আসবে। কিন্তু এসে যদি সে তাদের কাউকে না দেখে সে ফিরে আসার আগেই তারা যদি মরে যায়—— না না, বেচে থাকতে হবে, মরলে তার চলবে না। তার বনহুর আসবে কত আশা কত বাসনা নিয়ে—মনিরার মনে সেই আশার স্বপ্ন তাকে বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়।

মরিয়ম বেগমকে সান্ত্বনা দেয় মনিরা, মামীমা তুমি হারিয়েছো তোমার সন্তান, আর আমি হারিয়েছি স্বামী-পুত্র দু'জনকেই। ভেঙ্গে পড়লে সব শেষ হয়ে যাবে-নিঃশেষ হয়ে যাবে সবকিছু। সে যদি কোনোদিন ফিরে আসে তখন কি হবে? কে তাকে সামলাবে তোমার ছেলে যে বড়ই আঘাত পাবে সেদিন।

মরিয়ম বেগম বলেছিলেন—আমার মনির বেঁচে আছে?

হাঁ, মামীমা, মন বলছে সে বেঁচে আছে।

এরপর থেকে মরিয়ম বেগম ভেতরে ভেতরে গুমড়ে কেঁদে মরলেও প্রকাশ্যে আর তেমন করে কাঁদাকাটি করতেন না, পাষাণের মত হৃদয়কে শক্ত করে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মনকে কঠিন করলেও অন্তরে দুঃসহ জ্বালা দগ্ধীভূত করছিলো।

আজ নকীব বিজ্ঞাপনটা তার হাতে এনে দিলে তিনি একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মনিরাকে বললেন—দেখতো কি এটা?

অদূরেই মনিরা বসে কি যেন সেলাই করছিলো। মামীমার কথায় নকীব বিজ্ঞাপনখানা তার হাত থেকে নিয়ে মনিরার হাতে দিয়ে বললো—এক যাদুকর এসেছে খুব সুন্দর খেলা দেখায়।

তাই নাকি? মনিরা বিজ্ঞাপনখানা নকীবের হাত থেকে নিয়ে দেখতে লাগলো। বিজ্ঞাপনে একটা ছোট্ট শিশু একটা বাঘের সঙ্গে লড়াই করছে, বড় ভাল লাগলো ওর কাছে। বললো সে—মামীমা, সত্যি বড় অদ্ভুত এতটুকু তিন–চার বছরের একটা ছেলে বাঘের সঙ্গে লড়াই করবে এটা কম কথা নয়। যাবে মামীমা দেখতে?

ওসব আমার ভাল লাগে না মনিরা।

মামীমা, আমার বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে।

তাহলে সরকার সাহেবকে বলে দাও টিকিট করে আনতে।

মনিরা খুশী হয়ে নকীবকে বললো—সরকার সাহেবকে পাঠিয়ে দাও।

নকীব চলে গেলো।

যাদুর খেলা শুরু হবার অনেক পূর্বেই মামীমা ও সরকার সাহেব সহ মনিরা স্বপ্নরাগ থিয়েটার হলে গিয়ে হাজির হলো। আজ যেন মনিরাকে কোনো মায়ার আকর্ষণ প্রবলভাবে আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছে এখানে। কেমন যেন একটা বিপুল আগ্রহ তার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। যাদুকরের বাচ্চা শিশুটাকে দেখবার জন্যই মনিরা ছুটে এসেছে আজ যাদুকরের যাদুখেলা দেখতে।

সামনে ভেলভেটের গভীর লাল পর্দা ঝুলছে। পর্দার ওপর আঁকা শিশু আর বাঘের লড়াইয়ের ছবি। বাঘটা নীচে পড়ে রয়েছে একটি শিশু বাঘটার গলা টিপে ধরেছে। অদ্ভুত দৃশ্য, মনিরার হৃদয়ে একটা অনুভুতি নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে মনিরা ঐ পর্দার ওপরে কালো কাপড়ে আঁকা ছবির দিকে।

একটা অদ্ভূত ধরনের বাঁশির সুর ভেসে আসছিলো পর্দার ওপাশ থেকে। গোটা হলঘরের মধ্যে সেই সুরের আবেশ মোহ সৃষ্টি করে তুলেছিলো। দর্শকগণ তন্দ্রাচ্ছন্নের মত তাকিয়েছিলো লাল পর্দাটার দিকে।

এমন সময় পর্দা নড়ে উঠলো।

আকুল আগ্রহে তাকালো সবাই সেইদিকে।

ছুরি দিয়ে চিরে দু'ফাক করার মত ধীরে ধীরে দু'দিকে সরে গেলো লাল পর্দাটা। সামনে স্পষ্ট দেখা গেলো লম্বা একটা টেবিল। টেবিলে কাপড়ে ঢাকা রয়েছে কোনো একটা জিনিস। টেবিলের পাশে দাঁড়ানো বলিষ্ঠ অদ্ভুত চেহারার একটা লোক। লোকটার শরীরে গাঢ় লাল রঙের কোট-প্যান্ট। সবকিছুই লাল, এমনকি গলার টাইটাও লাল টকটকে! যাদুকরের চোখ দুটোও যেন তার পোশাকের সংগে খাপ খেয়ে গেছে, লাল গোলাকার দুটি চোখ। মাথার ক্যাপ রয়েছে ক্যাপটার দু'পাশ দিয়ে যতটুকু চুল বেরিয়ে আছে তাও লাল দেখা যাচ্ছে। লোকটার শরীরের রঙ তামাটে। দক্ষিণ হাতে একটি কঙ্কালের টুকরা।

যাদুকর এবার কঙ্কালের টুকরাখানা নিয়ে উঁচু করে ধরলো। একবার টেবিলে কাপড় ঢাকা জিনিসটার ওপর বুলিয়ে নিয়ে বললো—এই কাপড়ের নিচে কি আছে আপনারা কেউ জানেন না। আমি কাপড়টা তুলে ফেলছি দেখুন——

কাপড়টা তুলে ফেললো, সবাই দেখলো একটি বালিকা মৃতের ন্যায় টেবিলে শায়িত। বালিকা নিদ্রিত না জাগরিত ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

দর্শকগণ সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সেইদিকে। যাদুকর নিদ্রিত বালিকাটিকে পুনরায় কাপড়চাপা দিলো। এবার যাদুকর হাড়খানা নিয়ে একবার কাপড়-ঢাকা বালিকার দেহের ওপর বুলিয়ে নিলো, তারপর কাপড়খানা তুলে ফেললো, আশ্চর্য হয়ে সবাই দেখলো-টেবিল শূন্য-একটি লম্বা বলিশ পড়ে রয়েছে টেবিলটার ওপরে। যাদুকর এবার বালিশটা ঢেকে নিয়ে হাড়খানা বুলিয়ে বললো—আপনারা বালিশটাকে কিসের আকারে দেখতে চান?

একজন দর্শক বলে উঠলো—কুকুরের আকারে।

অন্য সকলেই বললো-হাঁ, আমরা সবাই একমত।

যাদুকর হাসলো, তারপর কাপড় ঢাকা বালিশটার ওপরে হাড়-খানা বুলিয়ে বিড় বিড় করে কি যেন মন্ত্র পাঠ করলো। তারপর তুলে ফেললো কাপড়খানা!

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়—সবাই স্তব্ধ দৃষ্টি মেলে দেখলো টেবিলে শুয়ে রয়েছে একটি কুকুর। কাপড়খানা তুলে ফেলতেই কুকুরটা ঝাপটা দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

দর্শকের করতালিতে ভরে উঠলো হলঘর।

আরও বিস্ময়কর অনেক খেলা দেখালো যাদুকর হরশঙ্কর।

হলঘর স্তব্ধ।

দর্শকগণ নির্বাক নয়নে খেলা দেখছিলো, এমন খেলা তারা কোনোদিন দেখেনি।

মনিরা ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলো—সেই শিশু বাঘের সঙ্গে লড়াইর দৃশ্যটা দেখবার জন্য।

সবশেষ খেলা সেটা।

সমস্ত দর্শক বিপুল আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করছিলো।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে যাদুকর তার বাঁ হাতে সেই কঙ্কালের টুকরাখানা আর দক্ষিণ হাতে একটা চাবুক।

একটা শিস দিলো যাদুকর।

অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন বলিষ্ঠ লোক একটা তিন চার বছরের শিশুসহ মঞ্চে উপস্থিত হলো। পেছনে চাকাওয়ালা একটা কাঠের বাক্স টেনে আনছে আর একজন বলিষ্ঠ লোক।

শিশুটিকে এনে দাঁড় করানো হলো।

দর্শকমন্ডলী একসঙ্গে তাকিয়ে আছে। মনিরা শিশুর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো, বিস্মিত হলো সে। হৃদয়ে একটা আলোড়ন শুরু হলো তার। এ মুখখানা যেন তার কোনো পরিচিত মুখের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এক মাথা সুন্দর কোঁকড়ানো চুল। ছোট্ট দেহ হলেও সুন্দর নধর চেহারা। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ। গভীর নীল দুটি চোখ। মনিরা কেমন যেন আনমনা হয়ে যাচ্ছে। নিজেই সে বুঝতে পারছে না তার এমন লাগছে কেন। অপলক নয়নে তাকিয়ে আছে মনিরা শিশুটির দিকে। অভূতপূর্ব একটা আকর্ষণ মনিরাকে হাতছানি দিচ্ছে। প্রবল বাসনা জাগছে তার মনে। একটি বার ঐ শিশুটিকে বুকে নিতে পারলে তার সমস্ত হৃদয় যেন জুড়িয়ে যেতো। কিন্তু মনিরা ভেবে পায় না কেন তার এমন হচ্ছে। ঐ ক্ষুদ্র মুখখানার সঙ্গে তার মনিরের মুখের হুবহু মিল সে যেন খুঁজে পাচ্ছে। না না তার ভুল নেই তার স্বামীর মুখখানাই যেন ঐ শিশুর মুখে লুকিয়ে রয়েছে। মনিরার মনে ভীষণ এক অশান্ত আলোড়ন শুরু হলো।

খেলা শুরু হয়ে গেছে।

যাদুকর একপাশে উদ্যত চাবুক হাতে দন্ডায়মান।

বলিষ্ঠ লোকটা চাকাওয়ালা কাঠের বাক্সটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

বাক্সের মধ্যে শিকের ফাঁকে বিরাট বাঘটা হুম হুম করে গর্জন করছে।

দর্শকগণ ভয়ে কম্পিত হলো হঠাৎ বাঘটা যদি তাদের আক্রমণ করে বসে তখন কি হবে! তবু সবাই বুকে সাহস নিয়ে দু'চোখে রাজ্যের ব্যাকুল আগ্রহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, খেলাটা তাদের দেখতেই হবে।

বলিষ্ঠ লোকটা কাঠের বাক্সের দরজা খুলে দিতে গিয়ে শিশুটিকে হাতের ইশারায় ডাকলো।

শিউরে উঠলো মনিরা, এও কি সম্ভব—এইটুকু কচি শিশু একটা বিরাট বাঘের সঙ্গে লড়াই করবে—না না, এ খেলা সে দেখতে পারবে না। কেন যেন তার বড্ড অস্বস্তি লাগছে।

যাদুকর এগিয়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে কাঠের বাক্সটার দরজাটা মুক্ত করে দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

মুহূর্তে বাঘটা গর্জন করে বেরিয়ে এলো।

সঙ্গে সঙ্গে শিশু মনি বাঘটার গলা জাপটে ধরে ফেললো, চড়ে বসলো বাঘের পিঠে দুহাতে বাঘটার গলা চেপে ধরে চাপ দিতে শুরু করলো। শুরু হলো বাঘের সংগে শিশুর লড়াই।

যাদুকর মাঝে মাঝে তার চাবুক উঁচু করে সপাং করে একটা শব্দ করেছিলো বাঘটা তখন মাটিতে চীৎ হয়ে পড়ে যাচ্ছিলো শিশু মনি চেপে বসছিলো তার বুকের ওপর। অনেকক্ষণ ধরে শিশু আর বাঘটার লড়াই চললো—হঠাৎ এক সময় শিশু মনি পড়ে গেলো নীচে, অমনি বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর বুকের ওপর।

দর্শকমন্ডলী হা হা করে উঠলো— যারা এতক্ষণ স্তব্ধ নিঃশ্বাসে শিশু আর বাঘের খেলা দেখে হতবাক— অবাক হচ্ছিলো তারা আর্তনাদ করে উঠলো এবার।

সঙ্গে সঙ্গে মনিরা দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেললো।

তারপর আর কিছু মনে নেই মনিরার।

যখন মনিরার সংজ্ঞা ফিরে এলো, তখন সে দেখলো তার নিজের কক্ষে বিছানায় সে শুয়ে আছে। শিয়রে বসে রয়েছেন মরিয়ম বেগম দু'চোখে তার রাজ্যের আকুলতা আর উদ্বিগ্নতা। একপাশে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ সরকার সাহেব ও নকীব। পাশে একটা চেয়ারে বসে ডাক্তার।

মনিরা চোখ মেলেই বলে উঠলো—মামীমা!

বলো মা?

আমার নূর কেমন আছে?

নূর! নূর কোথায়?

মনিরা তার হারিয়ে যাওয়া শিশু নূরের সম্বন্ধে মরিয়ম বেগমের নিকটে অনেক কথাই বলেছিলো। নূর কেমন আছে বলতেই মরিয়ম বেগম বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন—কোথায়, কোথায় তোমার নূর মনিরা?

মনিরা চারদিকে তাকিয়ে দেখে বললো—ঐ যে বাঘের সঙ্গে লড়াই করছিলো!

সে তো যাদুকরের ছেলে।

না না, আমার নূর ছাড়া সে অন্য কেউ নয়! মামীমা, তুমি দেখোনি সেই মুখ সেই চোখ দক্ষিণ বাজুতে সেই অদ্ভূত চিহ্ন—মামীমা, আমার নূর ছাড়া সে অন্য কেউ নয়। বলো বলো মামীমা সে বেঁচে আছে—বাঘটা তাকে মেরে ফেলেনি তো?

নারে না, তুই অমন হয়ে পড়লি—তোকে নিয়েই আমরা অস্থির হয়ে পড়লাম—ওদিকে দেখবার সময় ছিলো না।

তাহলে তোমরা জানো আমার নূরের কি হলো?

ডাক্তার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আপনি চুপ করে থাকুন। এখন বেশী কথা বললে খারাপ হবে।

না না, আমি চুপ করে থাকতে পারবো না, আগে বলুন আমার নূর কেমন আছে?

কোথায় আপনার নূর? সে তো যাদুকরের ছেলে।

না, সে আমার নূর।

কি করে বুঝলেন সে আপনার নূর?

আমি চিনবো না, আমার নূরকে চিনবো না—সেই মুখ সেই চোখ, দক্ষিণ বাজুতে সেই চিহ্ন—আমার নূর ছাড়া ও আর কেউ নয়।

ডাক্তার এবারও বললেন—হুঁ, সে সুস্থ আছে।

সত্যি বলছেন?

হাঁ।

সেদিনের পর থেকে মনিরা কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়লো, সব সময় যাদুকরের যাদুখেলা দেখতে যাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

কিন্তু মরিয়ম বেগম কিছুতেই তাকে যাদুখেলা দেখতে যাবার অনুমতি দিলেন না। মরিয়ম বেগমের বিশ্বাস—মনিরা তার নিজের সন্তানের মত চেহারার ছেলেকে দেখে অমন আত্মহারা হয়ে পড়েছে! আসলে ওর ছেলে কোথায় হারিয়ে গেছে, এতটুকু ছেলে বেঁচে আছে না মরে গেছে তাই বা কে জানে। মনিরার এই ব্যথা করুণ ভাব মরিয়ম বেগমকেও বেশ চঞ্চল করে তুললো। মরিয়ম বেগম মনিরাকে যতই সাবধানে রাখুন না কেন একদিন সকলের অলক্ষ্যে মনিরা একটা টেক্সি ডেকে বেরিয়ে পড়লো।

খেলা শুরু হবার পূর্বে স্বপ্নরাগ হলের সামনে অসংখ্য ভীড় জমে উঠেছে। রাস্তার অগণিত গাড়ী সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। শহরের সেরা লোকজনও বাদ যায়নি হরশংকরের যাদু খেলা দেখা থেকে।

মনিরার গাড়ী এসে থামলো স্বপ্নরাগ হলের সামনে, গাড়ীর ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়লো মনিরা। জনস্রোতের মধ্যে মিশে গেলো সে।

অতি সন্তর্পণে আত্মগোপন করে হরশংকরের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করলো মনিরা। হরশংকর তখন মঞ্চে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। অদূরে একটা শয্যায় শায়িত শিশু মনি একটা কিছু নিয়ে খেলা করছে সে। মনিরা লুকিয়ে পড়লো এক পাশের একটা খামের আড়ালে। হরশংকর এবার বেরিয়ে গেলো, যাবার সময় শিশু মনিকে লক্ষ্য করে বললো সে—মানু, ঘুমাবে না খবরদার।

মনি ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো—না, আমি ঘুমাবো না।

হরশংকর বেরিয়ে গেলো।

শিশু মনি শয্যায় বসে হাই তুলতে লাগলো—দ্বিপ্রহরে একটা শো হয়ে গেছে। মনি ক্লান্ত হয়েছে— এলিয়ে পড়ছে তার ছোট্ট শরীরটা। কিন্তু হরশংকরের ভয়ে সে ঘুমাতে পারছে না। ছোট মনি কতক্ষণ নিদ্রাহীন থাকতে পারে কতক্ষণই বা হরশংকরের চাবুকের কথা তার স্মরণ থাকে একসময় হাতের খেলনাটা খসে পড়লো একপাশে, মনি এলিয়ে পড়লো বিছানায়।

ওদিকে হরশঙ্করের যাদুখেলায় মুগ্ধ দর্শকবৃন্দের করতালিতে হলঘর মুখরিত।

এদিকে বিশ্রামকক্ষ থেকে হরশঙ্করের সাথীগণ সবাই ওদিকে চলে গেছে, একা মনি শয্যায় কাৎ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মনিরা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছিলো এই মুহূর্তটির। এবার সে অতি লঘু পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে মনির শয্যার পাশে দাঁড়ালো ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলো মনির মুখখানা। তারপর অতি সন্তর্পণে মনির দক্ষিণ হাতখানা উঁচু করে ধরলো চোখের সামনে এই তো সেই স্মরণীয় চিহ্ন যা আজও তার মনের পাতায় গভীরভাবে আঁকা হয়ে রয়েছে। মনিরা অতি ধীরে ধীরে মনির হাতখানা নামিয়ে রাখলো। পেয়েছে সে তার বহু দিনের হারানো রত্নকে। মনিরা কিছুতেই নিজকে সংযত রাখতে পারলো না—লঘু হস্তে বুকে তুলে নিলো মনিকে।

ক'দিন অবিরত খেলা দেখিয়ে মনির শিশু দেহ ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো, মনিরার কোমল হস্তের পরশে তার ঘুম ভাঙলো না।

মনিরা শিশু মনিকে বুকে তুলে নিতেই দরজার বাইরে কারও পদশব্দ শোনা গেলো।

মনিরা এই মুহূর্তে সম্বিৎ হারালো না, সে দ্রুত এবং অতি সন্তর্পণে দরজার একপাশে আত্মগোপন করলো।

একজন বলিষ্ঠ লোক প্রবেশ করলো সেই কক্ষে।

শিউরে উঠলো মনিরা এই মুহূর্তে যদি লোকটা তার অবস্থিতি জানতে পারে তাহলে আর রক্ষা নেই নূরকেও হারাবে, নিজেও বিপদে পড়বে। মনিরা খোদার নাম স্মরণ করতে লাগলো।

লোকটা যেমনি ওপাশে মনির বিছানার দিকে এগিয়ে গেছে ঠিক সেই সময় মনিরা দরজার পাশ থেকে বেরিয়ে গেলো বাইরে। তারপর অতি আলগোছে আত্মগোপন করে একটা গাড়ীর পাশে এসে দাঁড়ালো। চারদিকে নজর বুলিয়ে নিয়ে ড্রাইভারকে বললো—ভাড়া যাবে?

ড্রাইভার বললো—হাঁ মাজী। আপ যাওগী?

হাঁ চলো। মনিরা শিশু মনিকে নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলো।

ড্রাইভার ষ্টার্ট দিলো গাড়ীতে।

গাড়ী এবার উল্কাবেগে ছুটতে লাগলো।

ঘুম ভেঙে গেলো মনির গাড়ীর ভেতরে অন্ধকার থাকায় সে কিছুই দেখতে না পেলেও অবাক হলো বললো—আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

মনিরা বললো—বাড়ীতে।

তুমি কে? কচি মনি স্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করে বসলো।

আমি–আমি তোর মা!

না, আমার মা তুমি নও। তুমি কে আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

গিয়ে দেখো বাবা।

এদিকে যখন মনিকে নিয়ে মনিরা গাড়ীতে ছুটে চলেছে, তখন স্বপ্নরাগ থিয়েটার হলের হরশঙ্করের বিশ্রামকক্ষে হুলস্থুল পড়ে গেছে। তাদের খেলার শিরোমণি মানু নেই।

হরশঙ্কর মনির নাম রেখেছিলো মানু।

মানুর অন্তর্ধানে হইহুল্লোড় পড়ে গেলো, হরশঙ্কর রাগে বোমার মত ফেটে পড়লো। তাজ্জব ব্যাপার—এত সতর্কতার মধ্যেও কি করে মানু হারালো! কোথায় গেলো, কে তাকে নিয়ে গেলো?

সেদিন আর তেমন করে খেলা জমলো না।

ওদিকে মনিকে নিয়ে মনিরার গাড়ী চৌধুরী বাড়ীর গাড়ী বারান্দায় পৌঁছতেই শশব্যস্তে ছুটে এলেন সরকার সাহেব ও নকীব।

মনিরা ততক্ষণে মনিকে কোলে করে গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে দশ টাকার কয়েকটা নোট ড্রাইভারের হাতে গুঁজে দিয়ে দ্রুত অন্তপুরে প্রবেশ করলো।

সরকার সাহেব ও নকীব হতবাক হয়ে অনুসরণ করলো তাকে। সরকার াহেব শিশুটিকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন, এই শিশুই কাল রাতে তাদের সকলের সামনে একটা বিরাট বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছিলো।

আগে আগে চলেছে মনিরা কোলে তার শিশু মনি।

পেছনে বিস্ময়ভরা চোখে এগুচ্ছে সরকার সাহেব ও নকীব।

মনিরা ছুটে এলো মামীমার কক্ষে—মামীমা, দেখো দেখো কে এসেছে!

মনিরার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েই মরিয়ম বেগম ব্যস্তভাবে এগিয়ে এলেন। মনিরার দিকে তাকিয়ে তার কোলে গত রাতের সেই শিশুটিকে দেখতে পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই বললেন—একে তুই কোথায় পেলি মনিরা?

মামীমা, এ যে আমার নূর। একে তুমি চিনতে পারছো না?

পাগলী মেয়ে, তোর নূরকে হারিয়েছিস ছোট এক বছরের শিশু আর একে তুই চিনলি কি করে?

এই দেখো----মামীমা, মনির কচি হাতখানা তুলে ধরলো। এই সেই চিহ্ন যা আজও আমি ভুলতে পারিনি।

মরিয়ম বেগমের চোখের সামনে আর একটি কচি বাহু ভেসে উঠলো। আতুর ঘরে তার নিজের সন্তান মনিরের বাহুখানা। দাইমা নবজাত শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে বলেছিলো—বেগম সাহেবা , আপনার ভাগ্য অতি প্রসন্ন। রাজটিকা নিয়ে রাজকুমার এসেছে আপনার ঘরে। এ মস্ত একজন হবে———মরিয়ম বেগম আজ সেই কথা স্মরণ করেন। এ যে তার দক্ষিণ বাহুর সংকেত চিহ্ন---তবে কি, তবে কি এটাই তার বংশের প্রতীক তার মনিরের সন্তান, মরিয়ম বেগম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলেন ওকে। হঠাৎ মরিয়ম বেগম অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন—মনিরা তোর হারানো ধন ফিরে পেয়েছিস—সেই মুখ, সেই চোখ, সেই নাক, আমার মনিরের সব চেহারাই পেয়েছে----

শিশু মনি এসব দেখে হাবা বনে গেছে। অবাক হয়ে দেখছে এসব। ছোট্ট হলেও তার মন বা হৃদয় বলে তো একটা জিনিস আছে। শিশুকাল থেকে সে বন বাদাড়েই মানুষ হয়েছে সভ্য সমাজে মিশবার তেমন সুযোগ হয়নি এখনও। চৌধুরীবাড়ীর সাজসজ্জা, বিরাট বাড়ী নানা রকমের আসবাবপত্র আলোর ঝাড় কত রকমের কারুকার্যখচিত ফুলদানি এসব শিশু মনির চোখে রাজ্যের বিস্ময় জাগালো। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে সব দেখতে লাগলো।

মনিরা মনিকে পেয়ে আকাশের চাঁদ যেন হাতে পেলো। সর্ব প্রথম মনিকে নিয়ে ছুটে গেলো মনিরা বনহুরের ছোট বেলার ফটোখানার পাশে।

মনিকে দাঁড় করিয়ে বার বার তাকিয়ে দেখতে লাগলো বনহুরের ছোটবেলার চেহারাখানা আর শিশু মনিকে। ডাকলো— মামীমা, দেখে যাও। দেখে যাও এসে, দেখে যাও এসে।

মরিয়ম বেগম এলেন, সন্তানের ছবির পাশে মনিকে দেখে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তারপর জড়িয়ে ধরলেন মনিকে বুকের মধ্যে— দাদু! ওরে আমার নয়নের মনি, হৃদয়ের ধন --- মরিয়ম বেগমের চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুবিন্দু।

মনিরার চোখও শুষ্ক ছিলো না, স্বামীর কথা স্মরণ করে বুকটা তার ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিলো।

যাদুকর হরশংকর তার অমূল্য রত্ন মনিকে হারিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। যাদুর খেলা বন্ধ করে দিয়ে শহরময় চষে বেড়াতে লাগলো—কোথায় তার মানু।

কখনও সাপুড়ের বেশে, কখনও বানর খেলোয়াড়ের ছদ্মবেশে, কখনও বা ভিখারীর বেশে হরশঙ্কর শহরের আনাচে কানাচে প্রতিটি বাড়ীতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কখনও বা নানা রকমের খেলনা নিয়ে বিক্রি করতো শহরের পথে পথে।

হরশংকরের চাতুরি মনিরার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে পরাজিত হলো। কত সাধনা আর আরাধনার পর মনিরা তার নূরকে ফিরে পেয়েছে। এক মুহুর্ত মনিরা তার সন্তানকে নিজের কাছছাড়া করতো না। মনিরা জানতো, যাদুকর নূরকে হারিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন ও উন্মত্ত হয়ে পড়বে কারণ তার সেরা খেলাটাই সে নূরকে দিয়ে দেখাতো। তাই নূর ওর অমূল্য সম্পদ। নিশ্চয়ই যাদুকর নূরের সন্ধানে শহরটাকে তন্ন তন্ন করে চষে ফেলবে। তাই মনিরা যতদূর সম্ভব নূরকে সাবধানে রাখতে চেষ্টা করতো।

মনিরা যখন সন্তানকে নূর বলে ডাকলো তখন সে কোনো জবাব দিলো না, মনিরা তাই ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলো—বাবা তোমাকে কি বলে ডাকতো ওরা?

কচি মুখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলো সে—মাম্মা আমাকে মনি বলে ডাকতো।

আর যাদুকর?

ঐ দাদা? যাদুকরকে নূর দাদা বলে ডাকাতো।

হাঁ, দাদা তোমায় কি বলে ডাকাতো?

দাদা ডাকতো মানু বলে।

মনিরা ওকে বুকে চেপে ধরে বললো—তুমি আমার নূর। আমি তোমার নাম রেখেছিলাম নূর!

মাথা কাৎ করে বললো নূর—আচ্ছা।

অনেক সন্ধান করেও হরশংকর আর মানুকে খুঁজে পেলো না। শহরের নানা জায়গায় খুঁজে খুঁজে হয়রাণ পেরেশান হয়ে গেলো সে।

প্রায় এক সপ্তাহকাল কান্দাই শহর চষে ফিরে ক্লান্ত অবসন্ন হরশংকর একদিন ফিরে চললো নিজের দেশে, যেখানে নূরী অহরহ্ চোখের পানিতে বুক ভাসাচ্ছে সেই গহন বনে।

হরশংকরকে দেখে ছুটে এলো নূরী—মনি, আমার মনিকে আমায় ফিরিয়ে দাও। আমি ওকে না দেখলে মরে যাবো যে!

হরশংকর অন্যদিন হলে অট্টহাসি হেসে উঠতো। আজ যেন সে হাসতে পারলো না, কেমন গম্ভীর মুখে বসে রইলো নিশ্চুপ হয়ে।

এরপর হরংশংকর নূরীকে নিয়ে বের হবে মনস্থ করলো। এবার যাদুর খেলা স্থগিত রেখে চলবে নাচ-গান এতেই মোটা পয়সা উপার্জন হবে তার। আর দূরদেশে নয়, নিজ দেশের মধ্যেই চালাবে সে তার ব্যবসা।

❑

পুলিশ অফিস।

জন গাড়ী রেখে নেমে পড়লো। পুলিশ অফিসে প্রবেশ করতেই মিঃ লাহিড়ী এবং মিঃ রায় তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। অসময়ে জনকে পুলিশ অফিসে দেখে মিঃ লাহিড়ী কিছুমাত্র অবাক হলেন না, কারণ জন এমন আচম্বিতে আরও অনেক দিন পুলিশ অফিসে এসে হাজির হয়েছে। এটা যেন তার স্বভাব আর কি!

আজও মিঃ রায় এবং মিঃ লাহিড়ী কিছুমাত্র অবাক না হয়ে তাকে বসতে অনুরোধ জানালেন।

জন আসন গ্রহণ করেই বললো—এক্ষুণি আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে মিঃ লাহিড়ী।

কোথায়? জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ লাহিড়ী।

পরে সব জানতে পারবেন। আপনার সঙ্গে মিঃ রায় ও কয়েক জন পুলিশ থাকবে।

মিঃ লাহিড়ী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আপনার হেঁয়ালিভরা কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না মিঃ জন।

একটু হেসে বললো জন—মালতী হত্যারহস্য আজ উদ্‌ঘাটন করতে চাই মিঃ লাহিড়ী। আজ আপনি খুনীকে গ্রেপ্তারে সক্ষম হবেন।

হোয়াট?

ইয়েস, ইন্সপেক্টার! আপনি বিলম্ব না করে এই মুহূর্তে তৈরী হয়ে নিন।

মিঃ লাহিড়ী মিঃ রায়ের দিকে লক্ষ্য করে বললেন—কয়েকজন পুলিশসহ তৈরী হয়ে নিন মিঃ রায়, মিঃ জনের সঙ্গে বেরুবো।

জন নিজেই ড্রাইভ করে চললো তার গাড়ীখানা। জনের গাড়ীতে মিঃ লাহিড়ী আর মিঃ রায়। পেছনে একটি পুলিশ ভ্যান—কয়েকজন পুলিশ রয়েছে তাতে!

শহরের বড় রাস্তা ধরে গাড়ীখানা উল্কাবেগে ছুটে চললো।

রাত প্রায় বারোটা হবে!

পথের জনতা অনেক কমে এসেছে।

দোকানপাট কতকগুলো বন্ধ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

একটা স্বর্নকারের দোকানের অদূরে এসে জন গাড়ী থামিয়ে ফেললো।

পূর্বেই বলা ছিলো জনের গাড়ীর প্রায় বিশ গজ দূরে পুলিশ ভ্যান থামাবে ঠিক তাই থেমে পড়লো।

জন মিঃ লাহিড়ীকে লক্ষ্য করে বললো—আপনারা বাইরে অপেক্ষা করুন আমি স্বর্ণকারের দোকানে প্রবেশ করবো। খুনী এই দোকানে অপেক্ষা করছে।

মিঃ লাহিড়ী বললেন—খুনীর উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে মিঃ জন।

নিশ্চয়ই দেবো মিঃ লাহিড়ী। কথা শেষ করে জন স্বর্ণকারের দোকানে প্রবেশ করলো।

মিঃ লাহিড়ী এবং মিঃ রায় ওদিকের জানালার শার্শির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেখান থেকে কক্ষের ভেতর পরিস্কার সব দেখা যাচ্ছিলো। মিঃ লাহিড়ী চমকে উঠলেন, স্বর্ণকারের দোকানে মিঃ বাসুদেব শর্মা।

এত রাতে নিহত মালতীর পিতা বাসুদেব স্বর্ণকারের দোকানে কি করছে? ভাল করে লক্ষ্য করতেই বিস্ময় জাগলো মিঃ লাহিড়ী এবং মিঃ রায়ের মনে।

বাসুদেব কোনো একটা জিনিস স্বর্ণকারের হাতে দিতে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে জন সেখানে উপস্থিত হলো।

বাসুদেব জনকে লক্ষ্য করতেই জিনিসটা লুকিয়ে ফেললেন জামার পকেটে। কিন্তু জন সেটা দেখে ফেললো।

বাসুদেব জনকে দেখেই উঠতে যাচ্ছিলো।

জন রিভলবার উদ্যত করে ধরলো— খবরদার পালাতে চেষ্টা করবেনা।

বাসুদেব বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখে পুনরায় বসে পড়লেন।

জন উচ্চকণ্ঠে ডাকলো—ইন্সপেক্টার!

মিঃ লাহিড়ী এবং মিঃ রায় কক্ষে প্রবেশ করলেন।

স্বর্ণকার ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগলেন।

বাসুদেব বললেন—আমাকে এভাবে জব্দ করছো কেন জন?

জব্দ নয় মিঃ শর্মা , আপনাকে সম্মান দেখাতে এসেছি। প্রথমে জবাব দিন–এত রাতে এখানে কেন, কি কারণে এসেছেন?

বাসুদেব ঢোক গিলে জবাব দিলেন—আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার তোমাকে জানাতে রাজী নই।

ঠিক সেই মুহূর্তে ওদিক থেকে কাফ্রি লোকটা সরে পড়তে যাচ্ছিলো, জন ইংগিত করলো মিঃ রায়কে—ওকে লক্ষ রাখবেন যেন না পালায়।

মিঃ রায় মুহূর্তে সজাগ হয়ে দাঁড়ালেন, তার হাতেও পিস্তল ছিলো।

কাফ্রি চাকরটা কাঁচুমাচু মুখে বসে পড়লো বেঞ্চের ওপরে।

মিঃ লাহিড়ী অবাক হয়েছেন বাসুদেব মালতীর পিতা—তাকে এরকম অপদস্ত করার কি মানে হয়ই তিনি যেন কিছু বুঝতে পারছেনা গম্ভীর মুখে তিনি দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করতে লাগলেন।

মিঃ শর্মা ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও পুলিশের কাছে আপনাকে তা জবাব দিহি করতে হবে।

মিঃ লাহিড়ী বললেন—হাঁ, আপনাকে যখন যা জিজ্ঞাসা করা হবে সঠিক জবাব দেবেন আশা করি।

নিশ্চয়ই দেবো ইন্সপেক্টার।

জন দৃঢ়কণ্ঠে বললো—মালতীর হত্যাকারী স্বয়ং বাসুদেব।

বাসুদেব বিবর্ণ মুখে কম্পিত কণ্ঠে বললেন—মিথ্যা কথা!

জন বলে উঠলো—সম্পূর্ণ সত্য, আপনিই তাকে হত্যা করেছেন মিঃ শর্মা।

মিঃ লাহিড়ী বললেন—তার প্রমাণ?

প্রমাণ আছে মিঃ লাহিড়ী। তার পূর্বে আমি জানাতে চাই –মিস মালতী বাসুদেবের কন্যা নয়। বললো জন।

বাসুদেব ফেটে পড়লেন—মালতী আমার কন্যা এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

মিঃ শর্মা, আপনার ঐ কাফ্রি চাকর বারো বছর আগে পাঁচ বছরের একটি শিশুকন্যাকে চুরি করে এনে দেয়নি?

মিথ্যা—সব মিথ্যা! বাসুদেব যেন ফেটে পড়লেন।

জন এক টানে কাফ্রি চাকরটাকে সরিয়ে এনে তার বুকে রিভলবার চেপে ধরলো—বলো, মিস মালতী কার মেয়ে?

কাফ্রি চাকর একবার বাসুদেবের মুখে তাকিয়ে পুনরায় ফিরে তাকায় নিজের বুকে ঠেকানো রিভলবারের ডগায়।

জন বললো—সঠিক জবাব না দিলে এই মুহূর্তে তোমাকে হত্যা করবো।

কাফ্রি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো—কিছু বলতে গেলো, কিন্তু বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল সে।

মিঃ লাহিড়ী জনের এই আচরণে খুশী হতে পারছিলো না। কিন্তু নিশ্চুপ হয়ে দেখা ছাড়া উপায়ও ছিলো না কিছু বলার।

জন বললো—আর দু'মিনিট সময় দিলাম।

কাফ্রি এবার বলে উঠলো—হাঁ, আমি বারো বছর আগে মালতীকে চুরি করে এনেছিলাম।

কার মেয়ে সে? বলো, নচেৎ---

এক পুলিশ ইন্সপেক্টারের মেয়ে, ওর বাবার নাম যতীন্দ্র মোহন রায়।

আচম্বিতে বৃদ্ধ মিঃ রায় প্রতিধ্বনি করে উঠলো—যতীন্দ্র মোহন রায়ের কন্যা মালতী? বারো বছর আগে আমার প্রথমা কন্যা মাধুরী পাঁচ বছরের শিশু—বাইরের বারান্দা থেকে হারিয়ে গিয়েছিলো সেই কামান্না শহর থেকে.

কাফ্রি বলে উঠলো—হাঁ বাবু, ওকে আমি কামান্না শহর থেকেই চুরি করে এনেছিলাম।

মিঃ রায় ছুটে এসে কাফ্রির গলাটিপে ধরলেন—ওরে শয়তান, নর পিচাশ...তুই আমার মাধুরীকে...

জন মিঃ রায়কে ছাড়িয়ে দিয়ে বললেন—যা হবার হয়ে গেছে মিঃ রায়, এখন পূর্বের সেই শোক বিস্মৃত হয়ে নতুনভাবে এর বিচার করুন। এবার আপনারা স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, মিস মালতী বাসুদেবের কন্যা নয়।

বাসুদেব নতমুখে বসে রইলেন।

মিঃ লাহিড়ীর চোখ দু'টি তীব্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, বললেন—আশ্চর্য!

জন এবার বললো—এবার বুঝতে পারছেন? আরও পারবেন একটু পরে।

মিঃ লাহিড়ী পুনরায় বললেন—কিন্তু মিস মালতীকে বাসুদেব যে হত্যা করেছে তার প্রমাণ?

প্রমাণ আছে মিঃ লাহিড়ী।

হঠাৎ বাসুদেব বলে উঠেন—তুমি তাকে হত্যা করেছো জন। যে হীরার হার তুমি তাকে দিয়েছিলে সেটা ফিরিয়ে নেবার জন্যই তুমি তাকে হত্যা করেছো এবং হার নিয়ে গেছো।

মিস মালতীকে যে হত্যা করেছে, সেই হার তার নিকটেই আছে একথা সত্য।

বাসুদেব কেমন যেন শিউরে উঠলেন। একটু নড়েচড়ে বসলেন তিনি।

মিঃ রায় বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়েছিলেন, বার বার ঐ কাফ্রি চাকরটার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকাচ্ছিলেন—এই মুহূর্তে কেউ বাধা না দিলে ওকে তিনি গলা টিপে হত্যা করতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আজ সেই বারো বছর আগে হারিয়ে যাওয়া পাঁচ বছরের একটি শিশুকন্যার মুখ বার বার ভেসে উঠছিলো তাঁর চোখের সামনে। মিঃ রায় দাঁতে অধর দংশন করছিলেন।

জন এবার বাসুদেবকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো এবং পর মুহূর্তেই তাঁর পকেটে হাত দিয়ে একছড়া হীরার হার বের করে আনলো। এতোদ্রুত হস্তে এ কাজ করলো জন—অবাক হলেন মিঃ লাহিড়ী।

জনের চোখে আজও সেই কালো চশমা রয়েছে, যা সে কোনো সময়ের জন্যও চোখ থেকে খোলে না।

জন সেই হারছড়া হাতে নিয়ে উঁচু করে ধরলো—এই হার ছড়াই মালতীর মৃত্যুর কারণ।

অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন মিঃ লাহিড়ী—বাসুদেব তাহলে....

হাঁ, বাসুদেবই মালতীর হত্যাকারী।

মিথ্যা কথা। মালতী আমার কন্যা না হলেও তাকে আমি কন্যার মতই স্নেহ করতাম। কথা কয়টি বললেন বাসুদেব।

জন বললো—মালতীর মৃত্যুর পূর্বেও এ হার তার কণ্ঠে ছিলো। মিঃ লাহিড়ী, নিহত মালতীর কণ্ঠে যে আঁচড়ের দাগ পাওয়া গেছে তা এই ছিন্ন হারের।

বাসুদেব আবার বললেন—না, এ হার মৃত্যুকালে মালতীর কণ্ঠে ছিলো না, এটা সে মৃত্যুর ক'দিন আগে আমাকে রাখতে দিয়েছিলো।

না, এ হার মালতীর মৃত্যুর পূর্বেও তার কণ্ঠে ছিলো এবং এই হারের জন্যই তাকে হত্যা করা হয়েছে। জন হারছড়া স্বর্ণকারের হাতে দিয়ে বললো—দেখুন তো এটা নিখুঁত আছে কিনা?

স্বর্ণকার হারছড়া পরীক্ষা করে বললো—না, এটা নিখুঁত নেই। এটা থেকে একটি হীরা নেয়া হয়েছে।

বাসুদেব ফ্যাকাশে মুখে কিছু বলতে গেলো কিন্তু পারলো না।

হারখানা যখন মালতীর কণ্ঠ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় তখন মালতী নিজের দক্ষিণ হাত দিয়ে হারছড়া চেপে ধরেছিলো, তবু সেটা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিলো এবং হারের একটি পাথরসহ খানিকটা চেন মালতীর হাতের মুঠায় আবদ্ধ হয়ে রয়েছিলো।

মিঃ লাহিড়ী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন—কিন্তু কই, মৃত মালতীর হাতের মুঠোয় কোনো পাথর খন্ড বা কোনো চেন পাওয়া যায়নি তো?

আপনারা সেখানে পৌঁছবার পূর্বেই এক ব্যক্তি সেখানে পৌঁছেছিলো এবং মিস মালতীর হাতের মুঠা থেকে সে ঐ পাথরটা সরিয়ে নিয়েছিলো!

বাসুদেব এবার রাগতকণ্ঠে বললেন—মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। মৃত মালতীর হাতে কোনো হীরক হারের অংশ ছিলো না ইন্সপেক্টার।

মিঃ লাহিড়ী বললেন—এ কথা আপনি কি করে জানলেন মিঃ জন?

আমি সেই ব্যক্তি। এই দেখুন মিঃ লাহিড়ী...মিঃ জন পকেট থেকে একটি হীরা ও কিছুটা চেন বের করে বললো—এটাই ছিলো মিস মালতীর হাতের মুঠোয়।

মুহূর্তে বাসুদেবের মুখমন্ডল অমাবস্যার অন্ধকারের মত হয়ে উঠলো।

জন বলে চলেছে—হীরার হারখানা সম্পূর্ণ নিতে পারেনি খুনী, একখানা হীরা মালতী আঁকড়ে ধরে রেখেছিলো। আর হাঁ, মালতী শেষ পর্যন্ত খুনীকে চিনতে পেরেছিলো এবং সেই কারণেই খুনী তাকে হত্যা করেছে। সেই খুনী অন্য কেউ নয়, মালতীর পিতার রুপধারী বাসুদেব শর্মা।

মিঃ জনের কথা শেষ হতে না হতে মিঃ লাহিড়ী পকেট থেকে বাঁশী বের করে ফুঁদিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন পুলিশ কক্ষে প্রবেশ করলো। মিঃ লাহিড়ী বললেন—বাসুদেবকে গ্রেপ্তার করো!

সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেবের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দেওয়া হলো। কাফ্রি চাকরটা সেই সুযোগে পালাতে যাচ্ছিলো, মিঃ রায় তার ওপর বাঘের মত লাফিয়ে পড়লেন, তৎক্ষণাৎ তাকেও এরেষ্ট করা হলো।

মিঃ লাহিড়ী এবার বললেন—মিঃ জন, আপনি সেদিন ওখানে যাবার কারণ কি?

আমি মালতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার একটু পূর্বেই তাকে হত্যা করা হয়েছিলো। আমি জানতাম সেই মুহূর্তে সত্যি কথা বললেও আপনারা কেউ আমাকে বিশ্বাস করতে পারতেন না বরং উল্টো আমাকে গ্রেপ্তার করে আটকে রাখতেন। তাই আমি হীরার হারটি মৃত

মালতীর হাতের মুঠো থেকে খুলে নিয়ে আত্মগোপন করেছিলাম এবং শপথ গ্রহণ করেছিলাম মালতীর হত্যাকারীকে খুজে বের করবো। হত্যাকারীকে আবিষ্কার করতে গিয়ে আপনাদের অনেক সময় অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছি, আমাকেও আপনারা খুনী বলে সন্দেহ করেছেন— তাতেও আমি কিছুমাত্র উদগ্রীব বা বিচলিত হইনি।

মিঃ লাহিড়ী লজ্জিত কণ্ঠে বললেন—আপনার অনুমান সত্য মিঃ জন, আমি সন্দেহপরবশ হয়ে বহু সময় আপনাকে অনুসরণ করেছি।

জন বললো—মিঃ লাহিড়ী, অরুণ বাবু সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাকে অযথা বন্দী করে রেখেছেন। সে মালতী হত্যা ব্যাপারে ঘাবড়ে গিয়ে ভয় পেয়ে রাতের অন্ধকারে নিজের ছোরাখানাকেই গোপনে পুকুরের পানিতে নিক্ষেপ করতে গিয়েছিলো। আসলে সে মালতীকে সত্যই গভীরভাবে ভালবাসতো।

হাঁ, এবার তাকে মুক্তি দেবো মিঃ জন।

মিঃ লাহিড়ী স্বর্ণকারকে গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছিলেন, জন বললো—ওকে এরেষ্ট করবার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ স্বর্ণকার সম্পূর্ণ নির্দোষ। এবং সে আমাকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। স্বর্ণকারের সাহায্য ছাড়া আমি হয়তো এতো শীঘ্র এই খুনের সমাপ্তি বা রহস্য উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হতাম না। কাজেই স্বর্ণকার মহাশয়কে আমার অশেষ ধন্যবাদ।

স্বর্ণকার এবার হাস্যেজ্জ্বল মুখে বললেন—আপনি ঠিক সময় আমাকে ঐ একটি হীরা আর চেনখন্ড দেখিয়ে ছিলেন বলেই আমি আসল খুনীকে বাকী চারখানা হীরা সহ আবিষ্কার করতে সক্ষম হই এবং আপনার কথা অনুযায়ী কাজ করি। ওটা আমি কিনবো বলে তাকে কথা দেই এবং আপনাকে সংবাদ দিয়ে জানাই।

মিঃ লাহিড়ী জনের পিঠ চাপড়ে বললেন—আপনার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে আমাদের পুলিশ বাহিনীও নতি স্বীকার করলো মিঃ জন।

জন হাসলো।

মিস মালতীর হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটিত হলো।

বাসুদেব শর্মা ও কাফ্রি চাকরটাকে বন্দী করে নিয়ে পুলিশ ভ্যান এগিয়ে চললো।

জন মিঃ লাহিড়ী ও মিঃ রায়কে নিয়ে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলো।

পুলিশ অফিসে মিঃ লাহিড়ী এবং মিঃ রায়কে পৌছে দিয়ে ফিরে চললো জন।

বাড়ী পৌছেতেই এ্যানি ছুটে এলো জনের পাশে—হ্যালো ডালিং, কোথায় ছিলে তুমি এ ক'দিন?

জন চোখের কালো চশমাটা ঠিক করে নিয়ে বললো— মালটে হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটন করলাম।

ডালিং, তুমি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছো তো?

হাঁ এ্যানি।

তবে এবার আমাদের আনন্দ করতে কোনো ভয় নেই?

না এ্যানি, কিন্তু...কিছু বলতে গিয়ে জন থেমে গেলো।

এ্যানি ততক্ষণে জনের মুখের কাছে ঝুঁকে এসেছে, আবেগভরা কণ্ঠে বললো—ডার্লিং, তুমি কত সুন্দর!

এ্যানি, আমি শীঘ্রই আমাদের বিয়ের দিন ধার্য করে ফেলবো।

সত্যি?

হাঁ এ্যানি।

ডার্লিং.-----

এ্যানি, আমাকে এক গেলাস ঠান্ডা পানি পান করাতে পারো?

নিশ্চয়ই পারি। তুমি বসো আমি আনছি।

এ্যানি বেরিয়ে যায়।

একটু পরে ফিরে আসে এ্যানি, দক্ষিণ হাতে তার ঠান্ডা পানির গেলাস। কিন্তু জন কই?

এ্যানি ব্যস্তভাবে তাকালো কক্ষের চারদিকে, উচ্চকণ্ঠে ডাকলো—জন! জন! জন! তুমি কোথায়? হঠাৎ এ্যানির দৃষ্টি পড়লো সামনের টেবিলে, বিস্মিত হলো সে—জনের কালো চশমাটা পড়ে আছে টেবিলের ওপরে।

এ্যানি তুলে নিলো চশমাটা হাতে, পুনরায় উচ্চস্বরে ডাকলো-জন...জন....জন....

এ্যানির কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি জাগালো-জন-জন-জন।

পরবর্তী বই

মায়াচক্র

মায়াচক্র-১৪

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

দস্যু বনহুর যুবকের পাশে এসে কাঁধে হাত রাখলো।

চমকে ফিরে তাকালো যুবক।

বনহুর শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললো—মিঃ জন, এবার আপনি মুক্ত। যেতে পারেন, বাইরে আপনার গাড়ী অপেক্ষা করছে।

মিঃ জন ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো—তুমি কে? আর কেনই বা আমাকে এভাবে ভূগর্ভে আটকে রেখেছিলে?

মিঃ জন, আপনি বাড়ী ফিরে গিয়ে সব জানতে পারবেন। আসুন, আর বিলম্ব নয়.......

বনহুর আর মিঃ জন পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ীর পাশে এসে দাঁড়ালো। গাড়ীর দরজা খুলে ধরে বললো বনহুর—নিন উঠুন।

মিঃ জন ড্রাইভ্ আসনে উঠে বসে ষ্টার্ট দিলো।

বনহুর হাত নেড়ে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো—গুড্‌বাই, গুড্‌বাই....

মিঃ লাহিড়ী ও মিঃ রায় পুলিশ অফিসে বসে আজকের ঘটনা নিয়েই আলাপ আলোচনা করছিলেন, এমন সময় টেবিলে ফোনটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠলো—মিঃ লাহিড়ী রিসিভার হাতে উঠিয়ে নিলেন—হ্যালো, স্পিকিং মিঃ লাহিড়ী। আপনি কে কথা বলছেন?

ও পাশ থেকে ভেসে এলো বনহুরের কণ্ঠ—আমি মিঃ জন।

আপনি! ব্যাপার কি?

আমি এবার বিদায় নিচ্ছি বন্ধু।

সেকি? হ্যালো, সেকি কথা বলছেন?

হাঁ, আসলে মিঃ জন আমি নই—মিঃ জনের ভূমিকায় আমি অভিনয় করেছি।

আপনি—আপনি এ সব কি বলছেন?

মিঃ লাহিড়ী, আমার নাম জানলে আপনি আমাকে গ্রেপ্তার না করে ছাড়বেন না। আমি যেই হই, আমার উদ্দেশ্য ছিলো মালতীর আসল হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা এবং একমাত্র সেই কারণেই আমি বাধ্য হয়েছিলাম আপনাদের সকলের চোখে ধূলো দিয়ে মিঃ জনের চরিত্র বেছে নিতে। সে জন্য আমি তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। শুধু তাই নয়,

আপনাদের নিকট আমাকে অনেক মিথ্যা বলতে হয়েছে। আসল জন ফিরে এসেছেন, আমি এবার বিদায় নিচ্ছি।

হ্যালো.....হ্যালো, আপনি কে? বলুন আপনি কে? মিঃ লাহিড়ীর মুখমন্ডল উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলো।

অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণ অবাক হতভম্ভ হয়ে মিঃ লাহিড়ীর মুখভাব লক্ষ্য করছিলো। মিঃ রায় বুজতে পারছিলেন, নিশ্চয়ই ওপাশে এমন কোন আলোচনা চলছে যা মিঃ লাহিড়ীকে ভীষণভাবে উত্তেজিত করে তুলছে।

তখনও মিঃ লাহিড়ী বার বার হ্যালো.....হ্যালো করছিলেন।

হঠাৎ তিনি যেন মনোযোগ সহকারে নিশ্চুপ হয়ে পড়লেন, শান্তকণ্ঠে বললেন—আপনার পরিচয় দিন।

ওপাশ থেকে ভেসে এলো সেই অতি পরিচিত কণ্ঠ—আমি দস্যু বনহুর।

মিঃ লাহিড়ীর হাত থেকে রিসিভার খসে পড়লো—আচম্বিতে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন তিনি—দস্যু বনহুর!

মুহূর্তে পুলিশ অফিসার সকলের চোখেমুখে একটা প্রচন্ড ভীতিভাব ছড়িয়ে পড়লো। দূর দেশ হলেও দস্যু বনহুরের নাম তাদের কাছেও অতি পরিচিত। কারণ, দস্যু বনহুর সম্বন্ধে তারা যথেষ্ট অভিজ্ঞ।

মিঃ রায় বলে উঠলেন—মিঃ লাহিড়ী, কে আপনার সঙ্গে কথা বলছিলো?

মিঃ লাহিড়ী তখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছেন, তিনি বললেন–দস্যু বনহুর।

দস্যু বনহুর! এখানেও তার আবির্ভাব ঘটেছে?

হাঁ মিঃ রায়। শুধু ঘটেনি, সে এ-ক'দিন আমাদের মধ্যেই বিচরণ করছিলো।

বলেন কি?

মিঃ রায়, প্রথমেই আমার সন্দেহ হচ্ছিলো—লোকটির আচরণ স্বাভাবিক ছিলো না। যদিও তার গতিবিধি আমার কাছে অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ মনে হচ্ছিলো, তবু আমি তাকে কিছুই করতে বা বলতে পারছিলাম না।

মিঃ রায় বলে উঠেন—কারণ, তার কার্যে দোষণীয় কিছু ধরা পড়েনি কোন সময়।

হাঁ, সে কথা সত্য।

বরং সে আমাদের উপকারই করেছে।

মিঃ লাহিড়ী বললেন—উপকার করলেও সে অপরাধী মিঃ রায়। সে একজন দুর্ধর্ষ দস্যু।

অন্য একজন পুলিশ অফিসার বলে উঠেন–দস্যু বনহুর তাহলে এই মহানগরেও এসে হাজির হয়েছে?

অপর একজন থানা অফিসার বলে উঠলেন—দস্যু বনহুর যে এই দেশেও এসে হাজির হবে, এ যেন ধারণার বাইরে।
মিঃ রায় উৎকণ্ঠা ভরা কণ্ঠে বললেন—সত্যি আশ্চর্য।
মিঃ লাহিড়ী ভাবগম্ভীর গলায় বলে উঠলেন—দস্যু বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই মিঃ রায়। তার মত দুর্ধর্ষ দস্যু পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। একটু থেমে বললেন তিনি—কান্দাই নগর থেকে মহানগর তো সামান্য। পৃথিবীর যে কোন স্থানে তার আবির্ভাব ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। মিঃ রায়, দস্যু বনহুর শুধু দস্যুই নয়, সে একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি।
হাঁ, এ কথা আমরা অবগত আছি মিঃ লাহিড়ী। সত্যই এই দস্যু অদ্ভূত।
কিন্তু দস্যু মহাপ্রাণ হলেও তাকে আইনের চোখে ক্ষমা করা যায় না। মিঃ রায়, আপনি এখনই তৈরী হয়ে নিন—আমার সঙ্গে বেরুতে হবে।
কোথায় যাবেন?
মিঃ জনের ওখানে। কথা শেষ করেই উঠে পড়েন মিঃ লাহিড়ী।

❑

মিঃ জনের গাড়ী এসে থামলো গাড়ী-বারান্দায়।
ছুটে এলো এ্যানি গাড়ী দেখতে পেয়ে, উৎফুল্ল কণ্ঠে ডাকলো—ডার্লিং কোথায় গিয়েছিলে.....কথা শেষ হয় না এ্যানির, বিস্ময় ভরা চোখে থমকে দাঁড়ায়।
মিঃ জন এ্যানির মুখের দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল হতে গিয়ে থ' মেরে যায়—কারণ, এ্যানি তাকে চিনতে পারছে না। তার মুখে খোঁচা খোঁচা এক মুখ দাড়ি, মাথার চুলগুলো রুক্ষ, দেহটাও কেমন জীর্ণ হয়ে গেছে। মিঃ জন গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়ালো।
এ্যানি পিছিয়ে গেলো কয়েক পা।
মিঃ জন বলে উঠলো—এ্যানি।
কে, কে তুমি? এ্যানির দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়।
এ্যানি, আমি জন। আমাকে তুমি চিনতে পারছোনা?
না না.....জন, জন কই?
এ্যানি, তুমি বিশ্বাস করো—আমিই জন।

এ্যানি অপলক নয়নে তাকালো, মুখে চোখে তার গভীর বিস্ময় ফুটে উঠেছে। বললো সে—তুমি জন.....কিন্তু.....

হাঁ, এ্যানি আমিই জন, আর যাকে তুমি এতদিন জন ভেবে এসেছিলে, সে জন নয়।

কে তবে সে?

আমিও জানি না এ্যানি, কে সে? চলো অনেক কথা আছে, সব শুনলে তুমি বুঝতে পারবে।

এ্যানির মন থেকে সন্দেহ দুর হয় না, সে তখনও কেমন একটা ভাব নিয়ে তাকাচ্ছিলো জনের মুখের দিকে।

জন বললো—চলো এ্যানি।

এ্যানি অনুসরণ করলো জনকে।

কক্ষের মধ্যে গিয়ে একটা সোফায় বসে পড়লো জন, বললো—এ্যানি, বসো।

এ্যানি জনের নিকট থেকে বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে একটা সোফায় বসে পড়লো।

জন নিজের খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরা চিবুকে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললো—এখনও তুমি আমাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছোনা এ্যানি?

এ্যানি কোন জবাব না দিয়ে শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল জনের মুখের দিকে, মাঝে মাঝে এ্যানির দৃষ্টি জনের পা থেকে মাথা অবধি বিচরণ করে ফিরছিলো।

বললো জন—বলো, কবে তুমি লন্ডন থেকে এসেছো?

এ্যানি এবার জবাব দিলো—জুনের পহেলা তারিখে।

জন একটু চিন্তা করে বললো—দেড় মাস হলো এসেছো এ্যানি?

হাঁ!

আর আমি এ বাড়ি ত্যাগ করেছি পুরো দু'মাস হলো।

কেনো? আচম্বিতে প্রশ্ন করে বসে এ্যানি।

জন একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে—এ্যানি, আমার অদৃষ্টে যা ছিলো তাই ঘটেছে। তোমার কাছে সব খুলে বলবো, তুমি বিশ্বাস করো—আমিই জন।

আর সে?

বললাম তো জানি না কে সে, কি তার পরিচয়.....

জনের কথা শেষ হয় না; কক্ষে প্রবেশ করেন মিঃ লাহিড়ী এবং মিঃ রায়।

মিঃ লাহিড়ীকে দেখে উঠে দাঁড়ায় এ্যানি, কারণ তার সঙ্গে পূর্ব হতেই পরিচয় ছিলো এ্যানির।

এ্যানিকে উঠে দাঁড়াতে দেখে জনও আসন ত্যাগ করলো। জন ছিলো অত্যন্ত ঘরোয়া ধরনের যুবক, তাই সে মিঃ লাহিড়ী কিংবা মিঃ রায়ের সঙ্গে পরিচয় ছিলো না। জন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো পুলিশ অফিসার দু'জনার মুখে।

এ্যানিও কেমন বিব্রত রোধ করছিলো, কারণ জনকেই সে এখনও সম্পূর্ণ চিনে উঠতে পারেনি।

মিঃ লাহিড়ী বুঝতে পারলেন এদের দু'জনার মধ্যেই এখন একটা দ্বন্দ্ব চলছে। তিনি নিজেই পরিচয় দিলেন—আমি পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ লাহিড়ী আর ইনি ইন্সপেক্টার রায়। বসুন মিঃ জন, আপনার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতে এলাম।

মিঃ লাহিড়ী নিজেই আসন গ্রহণ করলেন।

অন্যান্য সকলেই আসন গ্রহণ করলো।

মিঃ জন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে পুলিশ অফিসারদ্বয়ের মুখে।

এ্যানি নিশ্চুপ।

মিঃ রায় অবাক হয়ে জনকে দেখছেন। আসল জন আর নকল জনের মধ্যে কতখানি তফাৎ ছিলো। জনও সুপুরুষ বটে, কিন্তু নকল জনের মত অতোখানি অদ্ভূত সুন্দর নয়। লম্বা চেহারা, উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, মাথায় কোঁকড়ানো একরাশ চুল। ওর চোখ দুটি কোন দিন দেখে নাই বা দেখবার সুযোগ ঘটেনি কারো। এর চোখ দুটি স্বাভাবিক অনুজ্জ্বল।

মিঃ লাহিড়ী বললেন—হাঁ, কি বলছিলেন আপনারা?

জন বললো—ইন্সপেক্টার, আপনারা নিশ্চয়ই এ ব্যাপার জানেন, আমাকে এক অজ্ঞাত যুবক অখ্যাত এক গলির অন্ধকারে একটি পড়োবাড়ীর ভূগর্ভে আটক করে রেখেছিলো।

না, এ ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মিঃ জন, আপনার নিকটে এ ব্যাপারটা আমি পুরোপুরিভাবে জানতে চাই। অবশ্য যদি আপনি কিছুমাত্র না গোপন করে বলেন?

মিঃ জন বললো—হাঁ, আমি কিছুমাত্র গোপন না করে সব বলবো এবং যতক্ষণ না বলতে পেরেছি ততক্ষণ আমি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিনা। এ্যানির দিকে তাকিয়ে বললো, এ্যানিও এখনো আমাকে জন বলে বিশ্বাস করতে পারেনি।

আচ্ছা, তাহলে আপনার সব কথা আমাদের যেমন শোনার প্রয়োজন, তেমনি মিস এ্যানিরও—কেমন, তাই না?

এ্যানি একবার মিঃ লাহিড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি নত করে নিলো। মনোভাব—নিশ্চয়ই জানা দরকার।

জন বলতে শুরু করলো—আজ থেকে প্রায় মাস দুই আগে একদিন আমি নিজের ঘরে টেবিলের পাশে বসে একখানা চিঠি লিখছিলাম, রাত তখন দেড়টার বেশী হবে। চিঠি খানা আমি লন্ডনে এ্যানির কাছেই লিখছিলাম। অনেক রাত— তবু চোখে ঘুম আসছে না, বার বার মনে পড়ছে এ্যানির কথা। এ্যানিকে লন্ডন ছেড়ে এসে মন আমার কিছুতেই সুস্থির হচ্ছিলো না। চিঠি লেখা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, নীচে নাম লিখে এবার উঠে দাঁড়াবো, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার পিঠে একটা ঠান্ডা শক্ত কোন জিনিস অনুভব করলাম। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে তাকালাম পিছনে। ভয়ে বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম।

মিঃ লাহিড়ী এবং মিঃ রায় স্তব্ধ হয়ে শুনছেন।

মিস এ্যানির অবস্থাও তাই, তার চোখে প্রবল আগ্রহ আর উদ্দীপনা। জনের কথাগুলো যেন সে গিলছে বলে মনে হলো।

জন বলে চলেছে—আমি দেখলাম, মুখে কালো রুমাল বাঁধা একটা লোক আমার পিঠে রাইফেল ঠেশে ধরেছে। আমি চীৎকার করতে যাবো, অমনি লোকটা মুখে হাত চাপা দিয়ে বললো "চীৎকার করলেই মরবে।" কাজেই আমি জীবনের ভয়ে চুপ করে গেলাম! যুবকটা আমাকে বললো তখন, "ভয় নেই, আমি তোমাকে কিছুই বলবো না বা হত্যা করবো না, শুধু আমার কথামত তোমাকে কিছুদিন সরে থাকতে হবে।" আমি এবার তাকে প্রশ্ন করলাম—কে তুমি? কি চাও? জবাব দিলো সে "আমি কে, পরে জানতে পারবে। আর চাইনা কিছুই; শুধু দরকার—তোমার জিনিস-পত্র ব্যবহার করবো।"

যুবকটা তারপর আমাকে আমার গাড়ীতে বসিয়েই নিয়ে গেলো নিজেই ড্রাইভ্ করে। তারপর এক পোড়োবাড়ীর গভীর মাটির তলায় একটা ঘরের মধ্যে আটকে রাখলো।

বলেন কি? বলে উঠলেন মিঃ রায়।

হাঁ, আমাকে আটকে রাখলো সে ঐ কক্ষটার মধ্যে।

মিঃ লাহিড়ী বললেন—আপনার সেখানে অসুবিধা হলো না?

না ইন্সপেক্টার, কোন অসুবিধা আমার হয়নি সেখানে। যদিও সেদ্ধ পাক-শাক আমার পেটে পড়েনি, কিন্তু অজস্র ফল-মূল আমার খাবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতো। পানীয় এবং দুধ আমার সেখানে দেওয়া হয়েছিলো। তবু আমি নিজকে সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করতে পারিনি, কারণ নানা দুশ্চিন্তা আমাকে অহরহ যাতনা দিয়েছে। এমন কি আমাকে সেখানে সেভ করার সরঞ্জাম দেওয়া স্বত্ত্বেও আমি সেভ করতে পারিনি।

তারপর মিঃ জন?

তারপর বেশ কিছু দিন চলে গিয়েছে, আজ হঠাৎ সেই যুবক আমাকে মুক্ত করে দিয়ে বললো—এবার আমার কাজ শেষ হয়েছে আপনি যেতে পারেন। আমি তার পরিচয় জানতে চাইলে বললো সে-সব জানতে পারবেন। বলুন ইন্সপেক্টার, আপনি তার পরিচয় জানেন কি?

হাঁ মিঃ জন, জানি।

মিঃ জন ও এ্যানি এক সঙ্গে তাকালো মিঃ লাহিড়ীর মুখের দিকে।

মিঃ লাহিড়ী বললেন—আপনাকে আটকে রাখার মূলে রয়েছে একটি হত্যাকান্ড।

অস্ফূট ধ্বনি করে উঠলো মিঃ জন—হত্যাকান্ড?

হাঁ, হত্যাকান্ড।

তাহলে সেই যুবক খুনী?

না, আপনি শুনুন মিঃ জন, সব বলছি।

বলুন ইন্সপেক্টার?

মিস মালতী নিহত হয়েছে।

মিস মালতী নিহত! বলেন কি?

হাঁ, তারই হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটন করার ব্যাপারে আপনাকে আটক রেখে রহস্যজাল ভেদ করেছে সেই যুবক। কারণ, আপনার চরিত্র তাকে এ হত্যা-রহস্য উদ্‌ঘাটন করারব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

কে-কে তাকে হত্যা করেছে ইন্সপেক্টার?

তার পিতা বাসুদেব।

বাসুদেব। অস্ফূট আর্তনাদ করে উঠে মিঃ জন।

হাঁ, বাসুদেব মিস মালতীর হত্যাকারী, এবং সে তার পিতা নয়।

পিতা নয়?

না।

কি কারণে বাসুদেব মালতীকে হত্যা করেছে?

সেই হীরক হার যা আপনি মিস মালতীর নিকটে গচ্ছিত রেখেছিলেন—

মিঃ লাহিড়ীর কথা শেষ হয় না, এ্যানি ক্ষিপ্তের ন্যায় বলে উঠলো—আমার হীরক হার মালতীর নিকটে গচ্ছিত....দু'হাতে মাথা টিপে ধরে এ্যানি—একি বলছেন?

মিঃ লাহিড়ী বলে উঠেন—ব্যস্ত হবার কিছু নেই মিস এ্যানি। কারণ, আপনার হীরক হারটি পুনরায় আপনার হাতে ফিরে এসেছে....কথা শেষ করে মিঃ লাহিড়ী এ্যানির হীরক হার ছড়া তার সম্মুখে বাড়িয়ে ধরলেন—আপনার ভাগ্য ভালো মিস এ্যানি। তাই এতো ঘটনার পরও আপনি হীরক হার ফিরে পেলেন।

এ্যানির চোখে মুখে খুশীর উৎস। আনন্দিত মনে মিঃ লাহিড়ীর হাত থেকে হার ছড়া নিয়ে এ্যানি নিজের চোখের সামেন তুলে ধরলো। এতো খুশী সে বুঝি আর কোন দিন হয় নাই। বললো এবার সে—ইন্সপেক্টার, আপনাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মিঃ লাহিড়ী বলে উঠলেন—মিস এ্যানি, এ হার ছড়া ফিরে পাবার জন্য ধন্যবাদ পাবার পাত্র আমি নই।

তবে?

দস্যু বনহুর!

এক সঙ্গে এ্যানি আর মিঃ জন অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—দস্যু বনহুর।

হাঁ, দস্যু বনহুর। তার অফুরন্ত চেষ্টা আর সহায়তায় মিস মালতীর হত্যা-রহস্য উদ্‌ঘাটন হয়েছে, এবং আপনার মূল্যবান হীরক হার ছড়া উদ্ধার পেয়েছে।

মিঃ জন বলে উঠেন—কি আশ্চর্য–দস্যু বনহুর?

হাঁ, দস্যু বনহুর। দস্যু বনহুরই আপনাকে আটক রেখেছিলো মিঃ জন।

মিস এ্যানির দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। আনমনা হয়ে গেলো এ্যানি....কালো চশমা পরা সুন্দর একটি মুখ ভেসে উঠলো তার মানসপটে...ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে টেবিল থেকে চশমাটা তুলে নিলো হাতে।

❑

কান্দাই থেকে মহানগর হাজার হাজার মাইল দূরে।

কান্দাই আর মহানগরের প্রায় মাঝামাঝি হলো ঝিন্দ শহর। বনহুর যখন ঝিন্দ শহরে বিরাজ করছিলো তখন বনহুরের কার্য-কলাপ এবং তার সমস্ত খবরা খবর মহানগরের জনগণের কানে কানে ছড়িয়ে পড়েছিলো। দস্যু বনহুরের দুর্ধর্ষ আচরণের কথা সবাই জ্ঞাত ছিলো। সেই দস্যুর আর্বিভাব সংবাদ যখন প্রতিটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় বৃহৎ আকারে প্রকাশ পেলো, তখন মহানগরের প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রত্যেকটি মানুষের প্রাণে জাগলো একটা ভীত ভাব। বনহুরকে তারা চোখে না দেখলেও তার সম্বন্ধে সকলের মনেই রয়েছে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক। দস্যু বনহুর মহানগরে পদার্পণ করেছে—খবরটা বিদ্যুৎ গতিতে মহানগরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো।

দোকানে, হোটেলে, ক্লাবে, জলসায় পথে-ঘাটে দস্যু বনহুরের সম্বন্ধে আলোচনা চলতে লাগলো। সকলের মনেই ভয়াতুর ভাব। না জানি সে কেমন দেখতে.....কেমন ভয়ঙ্কর তার চেহারা, এমনি কত কি। দস্যু বনহুর

নাকি দিব্য দিনের আলোতেও লোকের বুকে ছোরা বসিয়ে দিতে দ্বিধা বোধ করেনা। পথে-ঘাটে কোন মেয়ে বের হবার জো নেই, সে নাকি প্রকাশ্যে তাদের চুরি করে নিয়ে যায়। কেউ বাধা দিতে পারে না তার কাজে। আরও গুজব ছড়ালো লোকের মুখে মুখে, দস্যু বনহুর নাকি নর-মাংস ভক্ষণ করে।

হোটেল লারফাং আলোয় ঝলমল করছে। শহরের সবচেয়ে বড় হোটেল এটা। এখানে আভিজাত্য আর বংশ গৌরবে যারা গৌরবান্বিত, তাদেরই পদার্পণ হয়ে থাকে। সাধারণ কোনো নাগরিকের হোটেল লারফাং এ প্রবেশের উপায় নেই।

লারফাং সরগরম হয়ে উঠছে।

টেবিলে টেবিলে চলেছে নানা রকম খানা-পিনা আর হাসি গল্প। নানা জাতীয় যুবক-যুবতী হাসি আর গল্পের লহরীতে ভরে উঠছে লারফাং হোটেল।

এক পাশের একটি টেবিলের সম্মুখে আনমনে বসে কফি পান করছিলো বনহুর। ভাবছিলো সে.....এবার তার এখানের কাজ শেষ হয়েছে। মালতী হত্যা-রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হয়েছে, নিরাপরাধ অরুণবাবু মুক্তি পেয়েছে। মালতীর নিহতকারী বাসুদেব বন্দী, বিচারে তার ফাঁসি কিংবা দ্বীপান্তর হয়ে যাবে—তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবার বনহুর ফিরে যাবে নিজের দেশে, সেই কান্দাই শহরে। মনিরা তার প্রতীক্ষায় পথচেয়ে বসে আছে। তার মা না জানি কত উৎগ্রীব হয়ে পড়েছেন। হয়তো বা কত কান্দা-কাটা করছেন তিনি। মনিরার মুখখানা মনে পড়তেই বনহুরের হৃদয়ে একটা অপুলক শিহরণ বয়ে গেলো। মনের মধ্যে একটা আলোড়ন শুরু হলো, মনিরাকে কাছে পাবার প্রবল বাসনা তাকে উন্মত্ত করে তুললো। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো নূরীর কথা—মুহূর্তে একটা বিষন্নতার ছাপ ছড়িয়ে পড়লো বনহুরের গোটা মুখে। নূরী আজ বেঁচে নেই, তার হয়ত সলিল সমাধি হয়ে গেছে। নিষ্পাপ ফুলের মত একটি জীবন....নূরীর পবিত্র প্রেম-শিখা বনহুরের গোটা অন্তরে ছড়িয়ে আছে ধূপশিখার মত। এতোটুকু প্রেম ভালবাসার জন্য নূরী কিইনা করেছে। নূরীর অতৃপ্ত আত্মার কথা স্মরণ করে বনহুরের চোখ দুটো আশ্রু ছলছল হয়ে উঠে, তার মনের পর্দায় ভেসে উঠে আর একটি ছোট্ট সুন্দর কচি মুখ–মনি, সেও মুছে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে....বনহুর এবার রুমালে চোখ মোছে।

এমন সময় হঠাৎ বনহুরের কানে আসে হোটেলের মাইকে একটি গম্ভীর কণ্ঠস্ব—"আপনারা সাবধানতা সহকারে চলাফেরা করবেন, মহানগরেও দস্যু বনহুরের আর্বিভাব ঘটেছে। যে কোন মুহূর্তে দস্যু বনহুর আপনাদের উপর হামলা চালাতে পারে। "

বনহুর তখন কফির খালি কাপটায় শেষ চুমুক দিয়ে টেবিলে নামিয়ে রাখছিলো। হাতখানা তার থেমে গেল কাপটার পাশে, একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে। মিঃ লাহিড়ী তাহলে তার উপস্থিতিটা মহানগরের প্রতিটি নাগরিকের কানে পৌছে দিয়েছে।

বনহুরের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো, হোটেল লারফাং ভরে উঠলো মৃদু গুঞ্জনে। সকলেরই চোখেমুখে দেখা দিলো ভীতি ভাব। বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো লারফাং এর প্রতিটি জনতার মুখমন্ডল। সবাই তাকাতে লাগলো হোটেলের দরজার দিকে।

হোটেল কক্ষের দক্ষিণ দিকে একটা টেবিলে বসে ছিলো দু'জন যুবতী–কোন ধনিক দুহিতা হবে। অঙ্গে শোভা পাচ্ছে মূল্যবান অলঙ্কার। যুবতীদ্বয়ের মুখভাব অত্যন্ত ভয়-কাতর হয়ে পড়লো। তাদের সঙ্গে কোন পুরুষ নেই বোঝা গেলো, তাই এতো ভীতভাব দেখা দিয়েছে তাদের মধ্যে। যুবতীদ্বয় ফিস ফিস করে কথা বলতে শুরু করলো। বনহুরের অনতি দূরেই তাদের টেবিল, কাজেই তাদের কথাবার্তা যদিও নীচুস্বরে চলছিলো তবু কানে ভেসে আসতে লাগলো তার।

প্রথম যুবতী চাপা স্বরে দ্বিতীয় যুবতীকে লক্ষ্য করে বললো—পত্রিকার সংবাদটা জানার পর আমাদের এভাবে বের হওয়া ঠিক্ হয় নাই মলি!

দ্বিতীয় যুবতী ফ্যাকাশে মুখে কক্ষের দিকে একবার ভীতভাবে তাকিয়ে নিয়ে বললো—সত্যি জলি, আমার হৃদকম্প শুরু হয়েছে। দস্যু বনহুর নাকি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

হাঁ মলি, আমি শুনেছি—সে নাকি দিন-দুপুরে মানুষের বুকে ছোরা বসিয়ে দেয়। অসুরের শক্তি নাকি তার দেহে, দশ বিশজন শক্তিশালী পুরুষ নাকি তার কাছে কিছু নয়।

শুধু কি তাই, দস্যু বনহুর নরমাংস ভক্ষণ করে।

সত্যি?

বনহুর কথাটা শুনে আপন মনেই হেসে উঠলো। বনহুরের হাসির শব্দে ফিরে তাকালো জলি, বনহুর তখন একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে তাকালো উপরের দিকে নিজকে সংযত করে নেবার জন্য।

মলি বললো—আপনি হাসলেন কেনো?

বনহুর দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকালো যুবতীদ্বয়ের মুখের দিকে, একটু গম্ভীর হয়ে নিয়ে বললো–দস্যু বনহুর মানুষ হয়ে মানুষের মাংস ভক্ষণ করে কথাটা শুনে।

জলি বনহুরের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলো, এতোক্ষণ জলি এবং মলি বনহুরকে তেমন করে লক্ষ্যই করে নাই। বনহুরের সুন্দর বলিষ্ঠদীপ্ত চেহারায় মুগ্ধ হলো ওরা। জলি সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না।

মলিই প্রশ্ন করলো—কেনো, আপনার বিশ্বাস হচ্ছেনা বুঝি?

হাসবার চেষ্টা করে বললো বনহুর—বিশ্বাস না করে উপায় নেই। কারণ, তাকে যখন চোখে দেখিনি কোন দিন।

ভয় বিবর্ণ মুখে বললো মলি—সর্বনাশ, আপনি দস্যু বনহুরকে স্বচক্ষে দেখবার বাসনা রাখেন নাকি?

হাঁ, রাখি।

ভয় করে না আপনার?

সে তো বাঘ নয়। বললো বনহুর।

এবার জলি বললো—বাঘের চেয়েও সে ভয়ঙ্কর।

তাই নাকি? বললো বনহুর।

হাঁ, আপনি কি এ ক'দিনের পত্রিকা পড়েন নি? বললো মলি!

বনহুর যদিও সবগুলি পত্রিকা এবং সংবাদ সংগ্রহ করেছিলো বা পড়েছিলো তবু একটু না জানার ভান করে বললো—বিশেষ কোন কারণে পত্রিকা দেখবার সময় আমার হয়ে উঠেনি।

মলি এবার বললো—আসুন না আমাদের টেবিলে। প্লিজ আসুন। আমাদের বড্ড ভয় করছে।

বনহুর উঠে মলি আর জলির টেবিলে গিয়ে বসলো। জলি অপূর্ব সুন্দরী বটে, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ গায়ের রঙ, মাথায় কৃষ্ণ কালো চুল। টানা টানা ডাগর দুটি চোখ, উন্নত নাসিকা, লম্বা গঠন–সুন্দরী না বলে উপায় নেই। নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাটা বনহুরের কাছে যেন স্বপ্নময় হয়ে উঠলো। হেসে বললো বনহুর—কেনো, আপনাদের সঙ্গে কেন.....

না, আমাদের সঙ্গে কোন পুরুষ নেই, তাই আপনি যদি একটু....থেমে গেলো জলি।

বলুন কি করতে পারি?

মলিই বলে উঠলো–আমাদের একটু বাড়ী অবধি পৌঁছে দেবেন? অবশ্য মনে যদি কিছু না করেন।

এতো শীঘ্রই চলে যাবেন? বনহুর হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বললো... এখন তো সবে আটটা বাজে।

আমাদের বড্ড ভয় করছে। বললো জলি।

বনহুর ভ্রূকুঞ্চিত করে বললো—কেনো এতো ভয়?

মলি বললো—দস্যু বনহুরের জন্য ভয় পাচ্ছি আমরা—আপনাকে তো বললাম।

মুখভাব স্বাভাবিক করে নিয়ে বললো বনহুর—এতোগুলো লোকের মধ্যে দস্যু বনহুর প্রবেশ করবে, এতোবড় সাহস আছে তার?

জলি আর মলি এক সঙ্গে বলে উঠলো—কি বললেন?

বললাম, সে এই ভর সন্ধায় এই লোকজনে ভরা হোটেলে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে?

আপনি ঠিক্ জানেন না, দস্যু বনহুর স্বাভাবিক দস্যু নয়।

সে নরখাদক, তাই না? বনহুর কোন রকমে হাসি চাপতে চেষ্টা করে।

হাঁ সে নর-মাংস খায়। তার চেহারা নাকি অতি ভয়ঙ্কর বিশ্রী। রাক্ষসের মত....

এবার বনহুর চোখ বড় বড় করে বললো—এ রকম চেহারার লোক আছে নাকি দুনিয়ায়?

নেই, বলেন কি? দস্যু বনহুরকে যদি দেখতেন একবার.....তাহলে তো আমার জীবন নিয়ে ফিরে আসা দায় হতো।

জলি, মলি আর দস্যু বনহুর যখন আলাপ আলোচনা চলছিলো, তখন সমস্ত হোটেল কক্ষেই প্রতিটি লোক দস্যু বনহুরকে নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সকলেরই মুখে ঐ এক কথা— না জানি কোন্ মুহূর্তে দস্যু বনহুরের এই হোটেলে আবির্ভাব হবে।

জলি উঠে দাঁড়ালো—আমার ভয় হচ্ছে, আর বিলম্ব করা উচিৎ নয় মলি।

মলিও ততক্ষণে উঠে পড়েছে—চলো, এখন ভালয় ভালয় বাড়ী পৌছতে পারলে বেঁচে যাই।

জলি বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো–অনুগ্রহ করে আপনি যদি আমাদের সঙ্গে.....

নিশ্চয়ই চলুন। বনহুর উঠে দাঁড়ালো, তখনও তার ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসির আভাষ লেগে রয়েছে।

জলি আর মলি বনহুরের পাশে পাশে হোটেল কক্ষ ত্যাগ করলো।

জলি বললো—আমাদের গাড়ী আছে, আসুন।

অদূরে থেমে থাকা একটা গাড়ীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো জলি আর মলি। জলি পিছনের দরজা খুলে ধরে বললো—উঠুন।

বনহুর উঠে বসলো।

জলি ড্রাইভ-আসনে বসলো, মলি তার পাশে।

গাড়ী ছুটতে আরম্ভ করলো।

অদ্ভূত এ পরিবেশটা বনহুরের কাছে ভালই লাগছে। যার ভয়ে ভীত আতঙ্ক গ্রস্ত, তাকেই নিজেদের গাড়ীতে বসিয়ে নিয়ে চলেছে। আপন মনে হাসতে লাগলো বনহুর।

জলি বললো—ভাগ্যিস, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে এসেছেন, নইলে ভয়ে মরে যেতাম।

মলিও বান্ধবীর কথায় যোগ দিয়ে বললো—সত্যি, কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো। আচ্ছা আপনার নাম বা পরিচয় এখনও জানা হয়নি কিন্তু।

বনহুর বললে—যদি বলি আমিই দস্যু বনহুর।

এক সঙ্গে হেসে উঠলো জলি আর মলি।

মলি বললো—দস্যু বনহুর যদি আপনি হতেন তবে তো আমাদের আনন্দের সীমা থাকতো না।

তাই নাকি?

মলি পুনরায় বললো—যদি আপনার আপত্তি না থাকে, বলুন না আপনার পরিচয়টা?

আমার নাম নাসিম চৌধুরী। মহানগরের একজন নাগরিক আমি। আর আপনারা? বললো বনহুর।

মলিই জবাব দিলো—আমি মিঃ রায় এর কন্যা মলি। আর আমার বান্ধবী পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ লাহিড়ীর একমাত্র কন্যা জলি।

বনহুর চমকে উঠলো, অন্ধকার বলে মলি লক্ষ্য করতে পারলো না। জলি তো ড্রাইভ করছিলো।

এ শহরের আর কেউ তাকে না চিনুক মিঃ রায় এবং মিঃ লাহিড়ী তাকে চিনতে পারবেন—এ সুনিশ্চয়। বনহুর প্রমাদ গুণলো, এদের পৌঁছে দিতে গিয়ে মিঃ লাহিড়ীর নিকটে পাকড়াও না হয়ে পড়ে। এখন কি ভাবে এদের কবল থেকে ফসকানো যায়।

হঠাৎ বলে উঠলো জলি—এসে গেছি। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী থেমে পড়লো।

জলি নেমে দাঁড়িয়ে বললো–আসুন মিঃ নাসিম।

ততক্ষণে বনহুর নেমে দাঁড়িয়েছে গাড়ী থেকে—আপনারা পৌঁছে গেছেন, এবার আমি চলি?

না তা হয় না মিঃ নাসিম, আপনি আসুন–বাবার সঙ্গে আপনার পরিচয় হলে অনেক খুশী হবেন। কথাগুলো বললো জলি।

মলিও জেদ ধরে বসলো—এতোখানি উপকার যখন করলেন তখন আর একটু বইতে নয়, আসুন না জলি যখন বলছে।

বনহুর অগত্যা জলি আর মলিকে অনুসরণ করলো।

পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ লাহিড়ীর ড্রইং রুম।

মিস মলি আর জলির সঙ্গে বনহুর প্রবেশ করলো ড্রইংরুমে। সুসজ্জিত কক্ষ, ফিকে নীল রঙ করা দেয়াল। মেজের কার্পেটখানাও ফিকে নীল, কক্ষের মাঝখানে কার্পেটের বুকে গোলাকার করে সাজানো কয়েকটা সোফা সেট। সোফার কভারগুলোও ফিকে নীল রঙ এর। দরজা জানালার পর্দাও

ফিকে নীল রঙ কাপড়ের তৈরী। কক্ষ মধ্যে একটা নীল রঙ এর আলো জ্বলছিলো।

মিস জলি বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—বসুন, বাবাকে ডেকে আনছি।

জলি ভিতরে চলে গেলো, মলিও অনুসরণ করলো তাকে।

একটু পরে ফিরে এলো মলি আর জলি—সঙ্গে সঙ্গে মিঃ লাহিড়ী। কক্ষে প্রবেশ করে হতবাক স্তম্ভিত—কেউ নেই কক্ষে!

মিঃ লাহিড়ী অবাক হলেন, বললেন—কই সেই ভদ্রলোক যিনি তোমাদের পৌঁছে দিয়েছেন?

জলি আর মলি এক সঙ্গেই বলে উঠলো—এখানেই তো তিনি বসেছিলেন!

হঠাৎ মিঃ লাহিড়ী দেখতে পেলেন—সোফার উপর একটি কাগজের টুকরা পড়ে আছে। তিনি কাগজের টুকরাখানা হাতে তুলে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখমন্ডল অন্ধকার হয়ে উঠলো।

জলি বললো–কি হলো বাবা?

মিঃ লাহিড়ী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–পড়ে দেখো।

জলি কাগজের টুকরোখানা নিয়ে উচ্চ কণ্ঠে পড়লো। তাতে লিখা রয়েছে মাত্র কয়েকটা শব্দ ঃ

"মিঃ লাহিড়ী"

আপনার কন্যা মিস জলি আর তার বান্ধবী মিস মলি দস্যু বনহুরের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ায় তাদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেলাম।

— দস্যু বনহুর।

জলি আর মলির চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। মিঃ লাহিড়ী রাগে গস গস করে উঠলেন।

জলি আর মলির মুখে কোন কথা বের হচ্ছে না। দু'জন তাকাচ্ছে দু'জনার মুখের দিকে।

মিঃ লাহিড়ী বলে উঠলেন—বাইরের কাউকে বিশ্বাস করো না তোমরা। দস্যু বনহুর তোমাদের উপর কোন অন্যায় আচরণ করে নি তো?

মিস জলি বলে উঠলো—না বাবা, তার ব্যবহার অত্যন্ত মধুর ছিলো। আমাদের প্রতি কোন রকম খারাপ ব্যবহার করেনি।

মিঃ লাহিড়ী তখনও রাগে অধর দংশন করছিলেন।

জলি পুনরায় বললো—দস্যু বনহুর অমন হবে তা ভাবতেও পারিনি।

মিঃ লাহিড়ীর কন্যার কথায় কান না দিয়ে তখনই অফিসে ফোন করলেন। জানিয়ে দিলেন—দস্যু বনহুর তাদের আশে-পাশেই বিচরণ করে ফিরছে। পুলিশ বাহিনী যেন সদা সজাগ থাকে এবং শহরময় যেন সজাগ করে দেওয়া হয় এ ব্যাপারে।

❑

এই ঘটনার পর কেটে গেছে বেশ কয়েকটা দিন।

বনহুর সম্বন্ধে শহরময় নানা আতঙ্ক ভরা ভাবের সৃষ্টি হলেও বনহুর আজও কারো উপর হামলা চালায় নি বা কারো ধনভান্ডার লুটে নেয় নি, কিংবা কারো বুকে ছোরা বসিয়ে রক্তপাত ঘটায় নি।

শান্ত নাগরিকের মতই বনহুর মহানগরের বুকে আত্মগোপন করে রইলো।

শহরবাসীর মন থেকে দস্যু বনহুরের ভীতিভাব সম্পূর্ণ প্রশমিত না হলেও অনেকটা হাল্কা হয়ে এসেছে। সবাই আপন আপন মনে নিজ নিজ কাজ করে চলেছে।

নগরবাসী বনহুর সম্বন্ধে কিছুটা আশ্বস্ত হলেও পুলিশ মহল তাকে নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন রইলো, শহরের নানা স্থানে নানাভাবে সি আই ডি পুলিশ গোপনে অনুসন্ধান করে চললো। কিন্তু এতো করেও তারা বনহুরের সন্ধান পেলোনা।

বনহুর তখন লারফাং হোটেলের দ্বিতল একটি ক্যাবিনে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় দৈনিক পত্রিকাখানা পড়ছিলো। বাম হস্তের আংগুলের ফাঁকে অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট থেকে ক্ষীণ একটি ধুম্র রেখা ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছিলো।

অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পত্রিকার পাতায় দৃষ্টি বুলিয়ে যাচ্ছিলো। দস্যু বনহুরের আবির্ভাবে মহানগরে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিলো। প্রতিটি পত্রিকার পাতায় পাতায় বিরাট আকারে প্রকাশ পেতো বনহুরের আগমন বার্তা।

সমস্ত পত্রিকাখানায় একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বনহুর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। পত্রিকা ওয়ালারা বনহুরের নামে এ ক'দিনে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিয়েছে। কারণ, দস্যু বনহুরের আবির্ভাব সংবাদ পত্রিকায় এমন একটা আতঙ্ক আনয়ন করেছিলো যার ফলে নগরের প্রতিটি জনগণ সর্বক্ষণ পত্রিকার অপেক্ষায় প্রহর গুণতো। ধনী–দরিদ্র নারী–পুরুষ বিদ্বান–অবিদ্বান সবাই খরিদ করতো একখানা দৈনিক পেপার। দস্যু বনহুরের সংবাদ জানবার জন্য উদগ্রীব হয়ে সবাই পেপার দেখতো।

আজ পত্রিকার পৃষ্ঠায় দস্যু বনহুর সম্বন্ধে কোন তাজা খবর ছিলোনা। বনহুর নিজেও এ ক'দিন পত্রিকায় তার নামে নানা ধরনের আজগুবি গুজব পড়ে একটা কৌতুক অনুভব করতো, নির্জ মনেই হাসতো সে।

বনহুর আজ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, যাক পত্রিকাগুলি তাহলে আশ্বস্ত হয়েছে। হঠাৎ বনহুরের নজর চলে গেলো পত্রিকা খানার একটি জায়গায়— "আজ সন্ধ্যায় আন্দাম বন্দর থেকে জাহাজ "কাংঙ্গেরী" কান্দাই অভিমুখে রওয়ানা হচ্ছে।" কান্দাই --কান্দাই শব্দটা বনহুরের হৃদয় স্পর্শ করলো, আচম্বিতে মনের পর্দায় ভেসে উঠলো দুটি ব্যাকুল আঁখি উৎগ্রীব নয়নে তাকিয়ে আছে চৌধুরী বাড়ীর মুক্ত গবাক্ষে। তাকিয়ে তাকিয়ে হতাশ হয়ে যাচ্ছে আঁখি দু'টি গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। তার মনিরা--- বনহুর মনস্থির করে ফেললো—আজ সন্ধ্যায় সে আন্দাম থেকে "কাংঙ্গেরী" জাহাজে কান্দাই এর পথে রওয়ানা দেবে।

সন্ধ্যার পূর্বেই হোটেল লারফাং ত্যাগ করে ট্যাক্সিতে উঠে বসলো দস্যু বনহুর। মহানগর ত্যাগ করতে মনটা তার আজ কেমন যেন আনচান করছিলো। একটা বেদনা বোধ হচ্ছিল তার হৃদয়ে, কোন আপন জনকে যেন ছেড়ে যাচ্ছে সে এই মহানগরের বুকে।

ট্যাক্সি আন্দাম বন্দরে পৌঁছতেই ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়লো বনহুর।

আন্দাম, বিরাট বন্দর।

অগণিত জাহাজ ভাসমান অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে বন্দরের আশে পাশে। জেটিতে ভিড়ে দঁড়িয়েছে জাহাজ কাংঙ্গেরী। অগণিত যাত্রি জেটির সিড়ি বেয়ে এগুচ্ছে জাহাজ অভিমুখে।

ভোঁ বেজে উঠলো।

জেটি ত্যাগ করে কাংঙ্গেরী এগুতে লাগলো গভীর জলের দিকে।

ফার্ষ্ট ক্লাশ ক্যাবিনের একটি সোফায় গা এলিয়ে বসেছিল বনহুর। সম্মুখের কাঁচের জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিলো সে, ছেড়ে আসা মহানগরীর দিকে।

আন্দাম বন্দর ছেড়ে কাংঙ্গেরী দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছে মহানগরী। উচ্ছল জলরাশি খলখল শব্দে পিছিয়ে যাচ্ছে পিছনের দিকে। এবার বনহুর একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে অগ্নি-সংযোগ করলো।

সন্ধ্যার অন্ধকার এখন কাংঙ্গেরীর বুকে জমাট হয়ে উঠেছে। ক্যাবিনে ক্যাবিনে জ্বলে উঠেছে বৈদ্যুতিক নীলাভ আলো। যাত্রীরা সব আপন আপন জায়গা বেছে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দূর দেশের যাত্রী সবাই, বহুদিন তাহাদের কাটাতে হবে এই ভাসমান আবাসে। কাজেই সবাই চায় একটা আরামদায়ক সুখময় স্থান।

যাত্রীদের হই-হুল্লোড় আর জাহাজের ঝকঝক শব্দ মিলে একটা অদ্ভূত শব্দের সৃষ্টি করে চলছিলো।

ক্রমান্বয়ে রাত বেড়ে আসে।

জাহাজ এখন সাগরবক্ষে এসে পড়েছে।

যাত্রিগণ স্ব স্ব স্থান বেছে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে পড়ায় তেমন হই-চই আর নেই। তবু বেশী জনতার কলকণ্ঠের একটা প্রতিধ্বনি জাহাজটাকে মুখর করে রেখেছিলো।

বনহুর অৰ্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে নিক্ষেপ করে আর একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করতে গেলো, ঠিক সেই মুহূর্তে একটা নুপুরের শব্দ ভেসে এলো তার কানে; নুপুরের শব্দের সঙ্গে একটা বাঁশীর সুর।

বনহুর একমুখ ধুয়া সম্মুখের দিকে ছুড়ে দিয়ে সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। তারা ভরা আকাশের খানিকটা অংশ ভেসে ভেসে সরে যাচ্ছে তার চোখের সম্মুখ দিয়ে কাঁচের শার্শী পথে। আনমনে চেয়ে আছে সে।

বাঁশীর সুরের সঙ্গে নুপুরের আওয়াজ এখন আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে আরও কিছু শব্দ ভেসে আসছে—জনগণের করতালি আর হাস্যধ্বনি।

বনহুর নিশ্চিন্ত মনে ধূম পান করে চলেছে।

ডেকে কোন নৰ্ত্তকী হয়তো নাচ দেখাচ্ছে, ভাবলো বনহুর। বেশ কিছুক্ষণ হলো নুপুরের শব্দের সঙ্গে বাঁশীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে জনগণের হর্ষধ্বনি আর করতালি।

নিজের অজ্ঞাতেই বনহুর সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, এগিয়ে চললো ডেকের দিকে। দক্ষিণ হস্তের আংগুলের ফাঁকে তখনও অৰ্দ্ধদগ্ধ একটী সিগারেট। তাকিয়ে দেখলো বনহুর সম্মুখের দিকে। ডেকের উজ্জ্বল আলোতে নজরে পড়লো কতকগুলি লোক ডেকের দক্ষিণ দিকে গোলাকার ভাবে দাঁড়িয়ে কিছু দেখছে।

বনহুর থমকে দাঁড়ালো, যাবে কিনা ওখানে ভাবছে। এমন সময় পাশে এসে দাঁড়ালো জাহাজের ক্যাপ্টেন মিঃ মুঙ্গের। বনহুরকে সম্বোধন করে বললেন—হ্যালো মিঃ সেন, চলুন নাচ দেখবেন।

দস্যু বনহুর এ জাহাজে মিঃ চন্দ্রসেন নামে নিজকে পরিচিত করেছিলো। ক্যাপ্টেনের কথায় হেসে বললো—ধন্যবাদ, চলুন।

ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরের সঙ্গে বনহুর এগিয়ে চললো ডেকের দিকে।

জাহাজ তখন সীমাহীন জলরাশি অতিক্রম করে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে কোন অজানার পথে। চারিদিকে শুধু জল আর জল, স্থলের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

তারা ভরা আকাশ।

সপ্তমীর চাঁদ ডুবে গেছে কিছুক্ষণ আগে।

জনতামন্ডলীর পাশে এসে ঘাড় উঁচু করে উকি দিলো বনহুর—একটি নর্তকী এদিকে পিছনে ফিরে নাচছে। অপূর্ব অদ্ভূত সে নাচ। একটি লোক বাঁশী বাজাচ্ছে, শরীরে ঢিলা পা'জামা আর পাঞ্জাবী মাথায় মস্তবড় একটা পাগড়ী বাধা। লোকটার বাঁশীর সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচছে নর্তকী। এতোটুকু শিথিলতা নেই সেই দুটি চরণ যুগলে।

বনহুর অবাক হয়ে নর্তকীর পা দুখানা লক্ষ্য করছিলো। লোকটার বাঁশীর সুরে যেন কোন যাদু আছে, যার জন্য নর্তকীর পা দু'খানা যন্ত্রের মত দ্রুত ভাবে চলছিলো। আশ্চর্য এ নাচ।

হঠাৎ নর্তকী ঘুরে নাচতে লাগলো।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো–নূরী! দু'চোখে তার অতীব বিস্ময়।

ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী দাঁড়িয়ে ছিলেন বনহুরের পাশে, তিনি মিঃ সেনকে হঠাৎ নূরী শব্দ উচ্চারণ করতে দেখে এবং তার মুখভাব লক্ষ্য করে অবাক হলেন,বললেন—আপনি ওকে চেনেন?

যদিও বনহুর নূরীকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন তবু চট করে নিজকে সংযত করে নিয়ে বললো—নাচনেওয়ালীকে এর পূর্বে আর একবার দেখেছিলাম।

ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী হেসে বললেন –ও।

নূরী তখনও চঞ্চল চরণে নেচে চলেছে। বংশীবাদকের বাঁশীর সুরে তার চরণ যুগল যেন আরও দ্রুত হয়ে উঠছিলো।

বনহুরের মুখমন্ডল গম্ভীর হয়ে উঠলো। নূরী বেঁচে আছে; আনন্দিত হওয়ার চেয়ে ক্রুদ্ধ হলো সে বেশী। নূরী নর্ত্তকী হয়ে পথে–ঘাটে নেচে বেড়াচ্ছে–ছিঃ ছিঃ ছিঃ এর চেয়ে ওর মৃত্যু হলেও খুশী হতো সে। বনহুর তাকালো বংশীবাদকের মুখের দিকে। নরপিশাচের মতই দেখতে লোকটা। লম্বা–বিরাট দেহ; মস্ত মাথা, লম্বা নাক, মস্ত মস্ত একজোড়া গোঁফ, গোল গোল দু'টি চোখ, কেমন শয়তানী ভরা চাহনী। বনহুরের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। আর দাঁড়াতে পারলো না সে, ফিরে এলো নিজের কামরায়।

কিছুক্ষণ পূর্বেও বনহুরের মনোভাব স্বাভাবিক ছিলো। হাজার ব্যথাও তাকে একেবারে চূর্ণ–বিচূর্ণ করে দিতে পারেনি। হঠাৎ নূরীকে এভাবে দর্শন করায় বনহুর যেন সত্তা হারিয়ে ফেললে। সে ভাবতেও পারেনি— নূরী একজন নাচনে ওয়ালী হতে পারে।

ক্যাবিনের মেঝেতে ক্রুদ্ধভাবে পায়চারী করতে লাগলো বনহুর। মাঝে মাঝে অধর দংশন করছে, নূরীকে সে এভাবে দেখবে আশা করেনি কোন

দিন। নূরীর প্রেমকে সে এতো দিন অতি নির্মল সচ্ছবলে জেনে এসেছে। নূরীর ভালবাসা তার কাছে ফুলের মতই পবিত্র মনে হয়েছে, আর সেই নূরী কিনা--- বনহুর দু'হাতে নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে লাগলো।

ডেকের বুকে নূরীর নুপুরের শব্দ বনহুরের কানে গরম সীসা ঢেলে দিচ্ছে যেন। বনহুর দু'হাত কান চেপে ধরলো।

রাত বেড়ে আসছে।

এক সময় গোটা জাহাজটা সুপ্তির কোলে ঢলে পড়লো। নীরব হয়ে এলো যাত্রীদের কলকণ্ঠ। জাহাজের ইঞ্জিনের ঝক ঝক শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না।

বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো,বেরিয়ে এলো ক্যাবিনের বাইরে। সমস্ত জাহাজখানা নিস্তব্ধ, ঘুমিয়ে পড়েছে যাত্রিগণ।

বনহুর অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চললো। হঠাৎ চমকে উঠলো বনহুর— তার অদূরে একটা ক্যাবিনের পাশ কেটে অন্ধকারে আর একটি ছায়ামূর্তি এগিয়ে যাচ্ছে। বনহুর থমকে দাঁড়ালো, লক্ষ্য করলো কে এই লোক। কিন্তু বনহুর আশ্চর্য হয়ে দেখলো— লোকটার আপাদ মস্তক কালো আলখেল্লায় আবৃত। বুঝতে পারলো বনহুর-আলখেল্লাধারী নিশ্চয়ই কোন শয়তান। কোন কু'মতলবে সে এগুচ্ছে। বনহুর অনুসরণ করলো আলখেল্লাধারীকে কিন্তু কিছু দূর এগুতেই হঠাৎ তার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী। হাস্য উজ্জ্বল মুখে বললেন—হ্যালো মিঃ সেন।

বনহুর হেসে বললো—বড্ড গরম বোধ করছিলাম।

হাঁ, আজ আবহাওয়াটা বড় সুবিধে নয়। কেমন যেন একটি গুমোট ভাব দেখা দিয়েছে। ঝড় আসতে পারে।

তাই বুঝি আপনি--

না, ঠিক সে কারণে নয়, ইঞ্জিন-মেশিনটা একটু খারাপ বোধ হচ্ছিলো তাই দেখে এলাম। আচ্ছা, চলি মিঃ সেন। কথা শেষ করে ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী চলে গেলো নিজের ক্যাবিনের দিকে।

বনহুর ফিরে তাকালো—যে দিকে কিছুক্ষণ পুর্বে সেই আলখেল্লাধারীটিকে দেখতে পেয়েছিলো। কিন্তু কি আশ্চর্য লোকটা যেন হাওয়ায় মিশে গেছে।

বনহুর বিলম্ব না করে ফিরে এলো নিজের কামরায়।

শয্যায় শুয়েও এতোটুকু ঘুম এলোনা বনহুরের চোখে। সব সময় তার কানের কাছে যেন নূরীর চরণের নূপুরধ্বনি ভেসে আসছে। নূরী--নূরী--- ছোট বেলা থেকে নূরীকে বনহুর সাথী রূপে পেয়েছিলো। নূরীর প্রেম-ভালবাসা তার মনকে আচ্ছন্ন করতে না পারলেও বনহুর তাকে কোনদিন উপেক্ষা

করতে পারেনি। নূরীকে সে অন্তরের অনুভূতি দিয়ে ভালবেসেছে। নূরীর পবিত্র ভালবাসার মধ্যে আত্মসমর্পণ করেছে বনহুর। সেই নূরীকে সে আজ এরূপে দেখবে ভাবতে পারেনি---বনহুর এবার সোজা ডেকের বুকে এসে দাঁড়ালো। অদূরে যে ক্যাবিনটা দেখা যাচ্ছে-নূরী ওটাতেই রয়েছে। একবার ভাবলো বনহুর-সোজা নূরীর ক্যাবিনে প্রবেশ করে বলবে, কেনো-কেনো সে এ পথ বেছে নিয়েছে। এ পথ ছাড়া তার কি আর কোন গতি ছিলো না। রাগে ক্ষোভে অধর দংশন করে বনহুর। উষ্ণ হয়ে উঠে তার ধমনীর রক্ত।

বনহুর ক্যাবিনের শার্শী খুলে প্রবেশ করলো ভিতরে।

অদূরে মেঝেয় কম্বল বিছিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে নূরী। ক্যাবিনের স্বল্পালোকে তাকিয়ে দেখলো নূরীকে।

কতদিন পর নূরীকে দেখছে বনহুর, কিন্তু কোন বিস্ময় তার মনে জাগলোনা, জাগলোনা কোন অনুভূতি। বনহুরের শিরায় শিরায় তখন উষ্ণ রক্তের প্রবাহ।

ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় বনহুর এগিয়ে গেলো নূরীর পাশে। দাঁতে দাঁত পিষছিলো বনহুর, রাগে তার মাংসপেশীগুলি শক্ত হয়ে উঠছিলো। হাটু গেড়ে বসে পড়লো নূরীর শয্যার পাশে দু'হাত বাড়িয়েটিপে ধরলো নূরীর গলা।

সঙ্গে সঙ্গে নূরী জেগে গেলো চীৎকার করতে গেলো সে। বনহুর দক্ষিণ হস্তে চেপে ধরলো নূরীর মুখ।

নূরী তাকালো বনহুরের দিকে।

কিন্তু একি! বনহুরকে দেখেও নূরীর চোখে কোন ভাবের পরিবর্তন এলোনা।

নূরীর দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বনহুরের হাত দু'খান যেন শিথিল হয়ে এলো। নূরীর কণ্ঠ ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে। নূরী নিজের গলায় হাত বুলোচ্ছে এবং তাকাচ্ছে বনহুরের মুখের দিকে-আশ্চর্য! নূরী বনহুরকে দেখে একটা শব্দও উচ্চারণ করলোনা। নূরী যে তাকে চিনতে পেরেছে এমন মনে হলোনা।

বনহুরের মুখেও কোন কথা বের হচ্ছেনা, তবে কি নূরী তাকে চিনতে পারছেনা।

হঠাৎ বলে উঠলো নূরী—কে তুমি?

বিস্মিত বনহুর আরও বিস্মিত হলো, নূরী তাকে তাহলে চিনতে পারেনি। না তার মিথ্যা অভিনয়। বনহুর গম্ভীর চাপা কণ্ঠে দাঁতে দাঁত পিষে বললো-নূরী, তোমাকে এ ভাবে দেখবার পূর্বে তোমার মৃত্যু হলে অনেক খুশী হতাম।

নূরী আশ্চর্য দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে, বনহুরের কথায় তার চোখ দুটো আরও অবাক হলো। সে ওর কথাগুলো ঠিক বুঝে উঠতে পারছেনা।

বনহুর পুনরায় বলে উঠলো—নূরী, আমাকে তুমি ধোকা দিতে পারবেনা।

নূরী এবার বলে উঠলো—কে তুমি? এসব কি বলছো?

বনহুর নূরীর কথায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো তার মুখের দিকে। তবে কি এ নূরী নয়, নূরীর আকারে অন্য কোন মেয়ে? হয়তো তাই হবে নাহলে এতোক্ষণ তাকে চিনতে পারবেনা—এও কখনও হতে পারে! বনহুর অবাক নয়ননে নূরীর পা থেকে মাথা অবধি নিপুণ আঁখি মেলে দেখতে লাগলো। না না, ভুল তার হয়নি—ঐ তো নূরীর কপালে সেই ক্ষত চিহ্নটা–যা একদিন তারই আঘাতে হয়েছিলো। সেই মুখ সেই চোখ–একি, কোনদিন ভুলে যাবার! সেই কথা বলবার ভঙ্গী। নূরী ছাড়া এ অন্য কোন মেয়ে নয়--তবে কি নূরী তার সঙ্গে মিথ্যা ছলনা করছে?

বনহুর দৃঢ় মুষ্ঠিতে চেপে ধরলো নূরীর দক্ষিণ হাত—নূরী।

না, আমার নাম নূরী নয়।

নূরী নও তুমি? ছেড়ে দিলো বনহুর নূরীর হাত খানা, প্রশ্ন করলো—কে তুমি? কি তোমার নাম?

নূরী বনহুরকে চিনতে পারেনি এটা সত্য। নূরীকে যাদুকর যাদুর মায়াজালে নিজ সত্তা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলো। নূরী যা করছিলো–সব যাদুকরের যাদুর মায়ায়। এমনকি নূরীর দৃষ্টিশক্তিও অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলো, আপন জনকে সে দেখলেও চিনতে পারবে না বা পারছিলো না। বনহুর নূরীর স্বপ্ন–সাধনা –প্রাণের চেয়েও সে ওকে ভালবাসে, অথচ আজ সেই বনহুরকে কাছে পেয়েও নূরী চিনতে পারে না। বনহুরের প্রশ্নে নূরী জবাব দেয়—আমি নাচনেওয়ালী। আমার নাম মায়া।

অস্ফুট ধ্বনি করে উঠে বনহুর—মায়া।

হাঁ মায়া।

বনহুরের দৃষ্টি ধীরে ধীরে নত হয়ে আসে। সে অন্য একটি মেয়েকে নূরী বলে ভ্রম করেছে। আবার তাকালো বনহুর নূরীর মুখের দিকে—না, ভুল তার হয়নি—এই তো সেই নূরী---কিন্তু এর নাম যে মায়া।

বনহুর যেমনভাবে এসেছিলো তেমনি বেরিয়ে গেলো। একটা অব্যক্ত বেদনা তার সমস্ত অন্তরটাকে যেন নিষ্পেষিত করে চললো নূরী ছাড়া সে কেউ নয়। কিন্তু একি পরিবর্তন নূরীর মধ্যে!

গোটা রাত নানা দুশ্চিন্তায় কাটলো বনহুরের।

ন।

বনহুর ডেকে দাঁড়িয়ে সিগারেট পান করছিলো। ভোরের মিষ্টি হাওয়ায় দেহটা শান্ত-স্নিগ্ধ হলেও মনটা তখনও গুমড়ে কেঁদে মরছিলো। গত রাতের নূরীর কথাই স্মরণ হচ্ছিলো বার বার। যে নূরী তাকে না পেলে অস্থির হয়ে পড়তে, যে নূরী তার এতোটুকু ভালবাসার জন্য উদগ্রীব থাকতো-সেই নূরীর একি পরিবর্তন! হঠাৎ বনহুরের চিন্তাজালে বাধা পড়ে, সেই নুপুরের শব্দ।

বনহুর হাতের অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট সাগরের জলে নিক্ষেপ করে ফিরে দাঁড়ালো। অদূরে অনেকগুলি লোক জটলা পাকিয়ে গোলাকার ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিক থেকেই ভেসে আসছিলো নূপুরের শব্দ।

বনহুরের মুখমন্ডল কঠিন হয়ে উঠলো, আর দাঁড়াতে পারলো না, সে চলেগেলো নিজের ক্যাবিনে।

এমন সময় ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী বনহুরের ক্যাবিনের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো—হ্যালো মিঃ সেন, আসুন নাচ দেখা যাক।

না ক্যাপ্টেন, আমার শরীরটা ভাল বোধ হচ্ছে না আসুন এখানে বসে গল্প -সল্প করা যাক।

ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী প্রবেশ করলো বনহুরের ক্যাবিনে। বনহুরের পাশের আসনে বসে পড়লেন ক্যাপ্টেন -এতো অল্প সময়ে অসুস্থ বোধ করলে চলবে কি করে মিঃ সেন? এখনও বেশ কিছুদিন জাহাজ কোন বন্দরে ভিড়ছে না।

না না, তা বলছি না, আসলে মানে শরীরটা যেন একটু কেমন লাগছে আর কি।

বনহুর আর ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী কথাবার্তা হচ্ছিলো এমন সময় ডেকের জনতামন্ডলীর মধ্যে একটা হট্টগোলের শব্দ শোনা যায়।

ক্যাপ্টেন উঠে পড়েন-ব্যাপার কি, চলুন মিঃ সেন দেখা যাক।

বনহুরের ইচ্ছা না থাকলেও উঠতে বাধ্য হলো, এগিয়ে চললো সে ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরীর সঙ্গে।

জনতার ভীড় ঠেলে এগুতেই চমকে উঠলো বনহুর অদূরে ডেকের উপর সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে আছে নূরী। পাশেই সেই পাগড়ীওয়ালা বংশীবাদ হাতে আজ তার বাঁশী নেই-এক গাছা বেত। লোকটার চোখ-মুখ হিংস্র হয়ে উঠেছে।

ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী এগুতেই দর্শকের মধ্য হতে একজন বলে উঠলো— যেভাবে ওকে প্রহার করেছে জ্ঞান হারাবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

অন্য একজন বললো—মরে যায়নি তো?

বনহুর সিংহের ন্যায় গর্জন করে উঠলো—কেনো ওকে মারা হয়েছে বলতে পারেন?

তা আর পারবো না সাহেব। মেয়েটা নাচতে চাইছিলো না। কথাটা বললো প্রথম ব্যক্তি।

বনহুরের ভ্রূ কুঁচকে উঠলো, লোকটাকে দেখলেই শয়তান বলে মনে হচ্ছে তার। বনহুর তাকিয়ে রইলো লোকটার দিকে।

লোকটা তখন বিড়বিড় করে কি যেন মন্ত্র পাঠ করে নূরীর চোখেমুখে ফুঁ দিচ্ছিলো। কি আশ্চর্য, অল্পক্ষণের মধ্যেই নূরী চোখ মেলে তাকালো।

লোকটা এবার নূরীকে হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে একটা গেলাসে পানির মধ্যে কিছুটা ঔষধ মিশিয়ে নূরীর সম্মুখে বাড়িয়ে ধরলো–খেয়ে নে।

নূরী গেলাসটা হাতে নিতেই বনহুর দ্রুত এগিয়ে গেলো এবং সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় গেলাসটা নূরীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো দূরে।

মুহূর্তে শয়তান যাদুকর উঠে দাঁড়ালো দু'চোখে তার আগুন ঝরে পড়ছে।

ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী স্তম্ভিত হলেন। মিঃ সেন কেনো একাজ করতে গেলো ভেবে পেলেন না।

অন্যান্য দর্শকগণও হকচকিয়ে গেলো।

নূরী তখন তন্দ্রাচ্ছন্নের মত তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে। কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছেনা। বনহুর কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে চলে গেলো সেখান থেকে।

বংশীবাদক অন্য কেহ নয়—শয়তান হরশঙ্কর।

হরশঙ্কর বনহুরের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত পিষলো। মুখভাব তখন তার পিশাচের চেয়েও ভয়ঙ্কর দেখা যাচ্ছিলো।

সেদিন আর হরশঙ্করের নাচ-গান জমলো না।

বনহুর এ ব্যাপারের পর গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো। নিশ্চয়ই লোকটা কোন যাদুকর যাদুর মোহে নূরীকে সে তার সজ্ঞান অবস্থা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। না হলে নূরীর উপর সে এ ভাবে নির্মম ব্যবহার করতো না। বনহুরের মনে নূরীর প্রতি যে একটা অহেতুক রাগ হয়েছিলো সেটা এক্ষণে নষ্ট হয়ে গেলো–বুঝতে পারলো সে নূরী কোন শয়তান যাদুকরের মায়াচক্রে আবদ্ধ হয়েছে। যেমন করে হোক নূরীকে এই মায়াচক্রের আবেষ্টনী থেকে উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু তার উপায় কি নূরী তাকে কিছুতেই চিনতে পারছে না বা তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

বনহুর চিন্তাসাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলো। শয়তান লোকটাকে যেমন করে হোক পরাজিত করে নূরীকে উদ্ধার করা তার পক্ষে বিশেষ কোন

কষ্টকর হবে না, কিন্তু নূরী যদি তার সঙ্গে না আসে কিংবা তাকে বিশ্বাস করতে না পারে তা'হলে সব প্রচেষ্টা–সব সাধনা নষ্ট হয়ে যাবে।

সেদিন বৈকালে ডেকের ধারে রেলিং ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো নূরী। দৃষ্টি তার সাগর বক্ষে সীমাবদ্ধ।

আশে পাশে কোন লোক নেই।

বনহুর নূরীকে লক্ষ্য করে ধীরে পদক্ষেপে এগুলো। পাশে এসে দাঁড়ালো নূরীর।

চমকে ফিরে তাকালো নূরী, বনহুরকে দেখতে পেয়ে দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করতে যাচ্ছিলো।

বনহুর নূরীর দক্ষিণ হাত মুঠায় চেপে ধরলো—নূরী, যেওনা।

নূরী বিরক্তপূর্ণ চোখে তাকালো বনহুরের দিকে।

বনহুর পুনরায় ব্যাকুল কণ্ঠে বললো—নূরী আমাকে তুমি চিনতে পারছো না? আমি --- চাপা কণ্ঠে বলে উঠে সে—আমি বনহুর।

নূরী বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে চিনবার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই সে স্মরণ করতে পারে না–কোথায় কখন তাকে দেখেছে বা তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ছিলো কিনা মনে পড়ে না কোন কথা।

এমন মুহুর্তে অদূরে দেখা যায় হরশঙ্করকে সে নূরীকে তার কক্ষে না দেখে হন্তদন্ত হয়ে ডেকের দিকে আসছিলো। তখনকার সেই যুবকের পাশে নূরীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হরশঙ্করের চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠলো।

নূরীকে উদ্দেশ্য করে ইংগিত করলো হরশঙ্কর।

নূরী আর দাঁড়ালো না, চলে গেলো সেখান থেকে।

বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো।

হরশঙ্কর একবার কটমট করে বনহুরের দিকে তাকিয়ে চলে গেলো সেখান থেকে।

❑

যে কোন বন্দরে জাহাজ পৌঁছানোর পূর্বেই নূরীকে উদ্ধার করতে হবে, না হলে শয়তান ওকে নিয়ে উধাও হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যতক্ষণ না নূরী স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে পেয়েছে ততক্ষণ তাকে রক্ষা করবার কনো উপায় নেই। এ ক'দিন বনহুর নূরীকে আরও আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেছে নূরী বনহুরকে আজও চিনতে পারেনি।

এক সপ্তাহ হলো জাহাজ আন্দাম বন্দরে থেকে যাত্রা করেছে। এর মধ্যে কোন বন্দরে জাহাজ নোঙ্গর করেনি। বনহুর সতর্ক দৃষ্টি সব সময় হরশঙ্কর ও নূরীকে অক্টোপাশের মত ঘিরে রেখেছে। এমনকি বনহুরের রাতের নিদ্রা অন্তর্ধান হয়েছে। সদা-সর্বদা সে সজাগ রয়েছে কোন সময় যেন শয়তান লোকটা নূরীকে নিয়ে পালাতে না পারে।

বনহুরের শ্যেন্য দৃষ্টি নূরী এবং হরশঙ্করের উপরে যেমন রয়েছে তেমনি হরশঙ্করও বনহুরকে সদা লক্ষ্য রেখে চলেছে। বনহুরের আচরণ তার কাছেও সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে। জাহাজে কত না লোক আছে —কেউ তো তাকে এ ভাবে ফলো করে না বা তার কার্যকলাপে কোন রকম আপত্তি করে না। কিন্তু ঐ যুবকটা কেনো তার সঙ্গে এমনভাবে লেগে রয়েছে। হরশঙ্করও কম লোক নয় সেও ওকে দেখে নেবে।

সেদিন রাতে ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী যাত্রিগণকে জানিয়ে দিলেন আর দু'দিন পর জাহাজ কাংঙ্গেরী চাম্পাই বন্দরে পৌছবে তারপর সেখানে চব্বিশ ঘন্টা অবস্থান করার পর পুনরায় লুইয়া বন্দর অভিমুখে যাত্রা করবে কাংঙ্গেরী।

বনহুর বুঝতে পারলো—কান্দাই পৌছতে কাংঙ্গেরীর এখনও একমাসের বেশী সময় লাগবে। কিন্তু কান্দাই পৌছবার পূর্বেই নূরীকে উদ্ধার করে নিতে হবে।

হঠাৎ একটা শব্দে বনহুরের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো। রাত এখন দুটোর বেশী হবে। বনহুর নিজের ক্যাবিনে বসে কাঁচের শার্শীর ফাঁকে তাকিয়ে ছিলো ডেকের ওদিকে যেখান থেকে নূরীর কক্ষ দেখা যায়। বনহুর কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো। শব্দটা তারই ক্যাবিনের দরজার বইরে থেকে আসছিলো। বনহুর বুঝতে পারলো কেউ তার ক্যাবিনের দরজা বাইরে থেকে খোলার চেষ্টা করছে।

মুহুর্ত বিলম্ব না করে বনহুর নিজের শয্যায় এসে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো। চাদরের ফাঁকে চোখ দু'টি সে সজাগ করে রাখলো। দক্ষিণ হাতখানা বালিশের পাশে রইলো—যেখানে রয়েছে বনহুরের জমকালো রিভলভার খানা।

ক্যাবিনের দরজা খুলে গেলো।

অতি লঘু পদক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করলো একটা ছায়ামূর্তি সমস্ত শরীর তার কালো আলখেল্লায় ঢাকা। বনহুর চাদরের নীচে চমকে উঠলো, এই আলখেল্লাধারীকেই সে একদিন জাহাজের ডেকে আত্মগোপন করে বেরাতে দেখেছে। কি অভিসন্ধি নিয়ে তার ক্যাবিনে প্রবেশ করেছে এই ছায়ামূর্তি! বনহুর আপন মনে একটু হাসলো।

লোকটা সতর্ক চোখে তাকালো শয্যার দিকে, তারপর অতিলঘু পদক্ষেপে এগিয়ে গেলো টেবিলের পাশে। আলখেল্লাধারী এবার অতি সাবধানে টেবিলে থেকে সিগারেট কেসটা তুলে নিলো হাতে–তারপর কি যেন করলো লোকটা সিগারেট—কেসটা পুনরায় টেবিলে রেখে বেরিয়ে গেলো বাইরে।

বনহুর সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলো। ইচ্ছে করলে আলখেল্লাধারী যেই হোক তাকে কাবু করার তার পক্ষে কোনই কষ্টকর ছিলোনা, কিন্তু তাকে ধৈর্য ধরতে হলো, কাজ এখনও শেষ হয় নাই।

লোকটা ক্যাবিন ত্যাগ করতেই বনহুর শয্যা ছেড়ে নেমে দাঁড়ালো। সিগারেট—কেসটা হাতে তুলে নিয়ে একবার দেখলো একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে গেলো বনহুরের ঠোঁটের কোণে। সিগারেট কেসটা প্যান্টের পকেটে রেখে দ্রুত সেও ক্যাবিনের বাইরে বেরিয়ে এলো, সম্মুখে তাকাতেই দেখলো—ছায়ামূর্তি দ্রুত সম্মুখের একটা ক্যাবিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বনহুর আর একদন্ড দেরী না করে রেলিং এর আড়ালে আত্মগোপন করে আলখেল্লাধারীকে অনুসরণ করলো।

একি! এ যে ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরীর ক্যাবিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপার কি! তাহলে কি মুঙ্গেরীকেও হত্যা করবার চেষ্টা চলেছে? ক্যাবিনের নিকটে এসেই আলখেল্লাধারী যেন হাওয়ায় মিশে গেলো।

বনহুর আড়ালে দাঁড়িয়ে ভাবলো—তার চোখেও ধুলো দিলো, এমন জন এই আলখেল্লাধারী। কিন্তু ততক্ষণ বা ক'দিন বনহুরের দৃষ্টির আড়ালে আত্মগোপন করে থাকবে?

বনহুর ফিরে এলো নিজের ক্যাবিনে।

এবার বড় লাইটটা জেলে সিগারেট—কেসটা হাতে তুলে নিলো বনহুর। একটা সিগারেট হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো—না, সিগারেটগুলি সম্পূর্ণ নিখুঁত রয়েছে। কিন্তু এ সিগারেটগুলি যে তার নিজস্ব সিগারেট নয় তার বেশ বুঝতে পারলো বনহুর। এগুলো নিশ্চয়ই কোন মারাত্মক বিষ দ্বারা তৈরী তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর একটা সিগারেট পান করলেই মৃত্যু তার অনিবার্য।

বনহুর সিগারেটগুলি সিগারেটকেস থেকে বের করে নিক্ষেপ করলো কাছের শার্শী দিয়ে সাগরবক্ষে। তারপর ক্যাবিনের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে শার্শী খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে। ডেকের রেলিংএর রড এগুলো—একটু পা ফসকে গেলেই অথৈ জল রাশি। নীচেই ইঞ্জিনের দাঁতওয়ালা চাকা, একবার যদি পড়ে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের চাকার

মধ্যে দেহটা নিষ্পেষিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বনহুর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রেলিং বেয়ে এগুতে লাগলো। যেমন করে হোক নূরীর কক্ষে তাকে পৌঁছতে হবে।

ক্যাবিনের সম্মুখ ভাগ দিয়ে গেলে নিশ্চয়ই সে আলখেল্লাধারী তাকে দেখে ফেলবে বা দেখে ফেলতে পারে। কাজেই বনহুর এই পথে নূরীর ক্যাবিনের দিকে এগুচ্ছে। নূরীর ক্যবিনে পৌঁছতে আরও দু'টি ক্যাবিন পার হয়ে তবে যেতে হবে। হঠাৎ বনহুরের কণ্ঠে ভেসে আসে চাপা গম্ভীর কণ্ঠস্বর। দু'জন পুরুষ গুরুগম্ভীর গলায় কোনকিছু আলোচনা করছে বলে মনে হলো।

বনহুর অতি সাবধানে রেলিংএর উপর দিয়ে ক্যাবিনটার পিছনে শার্শীর পাশে এসে পৌঁছলো। একবার নীচে তাকিয়ে দেখে নিলো সে। নীচে অসীম জলরাশি গর্জণ করে ছুটে চলেছে। জাহাজের ইঞ্জিনের ঝক ঝক শব্দ আর ঝাকুনি বনহুরের দেহে এবং মনে এক অদ্ভুত আলোড়ণ সৃষ্টি করে চলেছিলো। অতি মনোযোগ সহকারে কান পাতলো বনহুর পিছনে শার্শীর ফাঁকে শুনতে পেলো কে যেন গম্ভীর চাপা গলায় বলছে-"বন্দরে পৌঁছবার আগেই ওকে সরাতে হবে।" অন্য আর একটি কণ্ঠ—"বোট নৌকাখানা তাহলে জাহাজের পিছনে অংশে বেঁধে রাখলেই চলবে।" পূর্বের কণ্ঠ—"হাঁ পিছনেই বোট-নৌকা বাধা থাকবে। তারপর গভীর রাতে মেয়েটিকে নিয়ে বোটে চাপতে হবে।" দ্বিতীয় ব্যক্তির গলায় আওয়াজ-"মেয়েটি সজ্ঞানে এভাবে বোটে চাপতে রাজি হবেনা।" অন্য কণ্ঠ—"না, ওকে অজ্ঞান অবস্থায় নিতে হবে বুঝলে?" কাল রাত দু'টো মনে রেখো।

বনহুর বুঝতে পারলো, নূরীকে সরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নিশ্চয়ই তার গতিবিধি ওরা ধরে ফেলেছে। জাহাজ বন্দরে পৌছার পূর্বেই একাজ তারা সমাধা করবে।

বনহুরের কানে এলো আবার প্রথম ব্যক্তির কণ্ঠ—লোকটাকে আমার প্রথম থেকেই কেমন সন্দেহ হয়েছিলো। মায়ার নাচ দেখেই লোকটা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে পড়লো।

বনহুরের ঠোটের কোণে এবার একটা হাসির ক্ষীণ রেখাফুটে উঠলো। আর শোনার কিছু নেই। বনহুর অতি সাবধানে এগুলো এবার নিজের ক্যাবিনের দিকে। আজ আর চিন্তার কিছু নেই,কালকের জন্য তাকে তৈরী হতে হবে।

ক্যাবিনে ফিরে এসে সিগারেট—কেসটায় সিগারেট ভর্তি করে টেবিলে রাখলো বনহুর, তারপর শয্যায় শুয়ে পড়লো নিশ্চিন্ত মনে।

পরদিন বেলা অনেক হয়ে গেছে তবু ঘুম ভাংছেনা বনহুরের।

ক্যাবিনের দরজায় এসে দাঁড়ালো ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী মৃদু টোকা দিয়ে ডাকলেন—মিঃ সেন, মিঃ সেন?

বনহুর পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করলো।

পুনরায় ক্যাবিনের দরজায় টোকা পড়লো—মিঃ সেন?

দরজায় ধাক্কা দিতেই খুলে গেলো। মুঙ্গেরী ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করে দ্রুত এগিয়ে গেলো শয্যার দিকে—মিঃ সেন, মিঃ সেন? গলায় তাঁর উৎকণ্ঠা ভাব।

ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরীর ধাক্কায় গা মোড়া দিয়ে পাশ ফিরে উঠে বসলো বনহুর হাই তুলে বললো—ক্যাপ্টেন।

গুডমর্নিং, মিঃ সেন।

গুডমর্নিং, বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বসুন ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী, বসুন।

মুঙ্গেরী আসন গ্রহণ করেন।

বনহুর শয্যা ত্যাগ করে সোফায় এসে বসলো। টেবিল থেকে সিগারেট-সেটা হাতে তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরলো মিঃ মুঙ্গেরীর দিকে—নিন।

থ্যাঙ্ক ইউ। সিগাটে আমার কাছেই আছে। কথা শেষ করে নিজের পকেট থেকে সিগাটে-কেসটা বের করে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলেন ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী।

বনহুর একটা সিগারেট নিজের কেস থেকে নিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরলো।

ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরীর মুখমন্ডল ক্ষণিকের জন্য বিবর্ণ হলো যেন, পর মুহুর্তেই নিজকে সামলে নিয়ে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে ম্যাচের কাঠিটা বাড়িয়ে ধরলো বনহুরের ঠোটে চেপে ধরা সিগারেটটার দিকে।

বনহুর একটু নীচু হয়ে নিজের সিগারেটটা ক্যাপ্টেনের বাড়িয়ে ধরা ম্যাচে কঠি থেকে অগ্নি সংযোগ করে নিলো। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো বনহুর-আজ গোটারাত ঘুমিয়েছি ক্যাপ্টেন—আপনি?

আমিও ঘুমিয়েছি মিঃ সেন।

সুখনিদ্রা—কি বলেন?

হাঁ মিঃ সেন। কথার ফাঁকে ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর সিগারেট থেকে ধুম্ররাশি নিক্ষেপ করলো সামনের দিকে।

ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী উঠে দাঁড়ালো—আমি একটু কাজে যাচ্ছি মিঃ সেন, পুনরায় অর্দ্ধঘন্টা পর ফিরে আসছি।

আচ্ছা ক্যাপ্টেন।

গুড্‌বাই।

অস্ফুট কণ্ঠে বললো বনহুর—গুড বাই।

❑

গভীর রাত।

বনহুর বার বার হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। একবার সে প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে রিভলভারের অস্তিত্ব অনুভব করে নিলে। আজ আকাশের অবস্থা খুব ভাল নয়। সন্ধ্যার পর থেকে কেমন একটু ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ঝড় তুফান না হলেও দুর্যোগপূর্ণ রাত এটা।

সমস্ত জাহাজটা নিস্তব্ধ নিঝুম।

জাহাজের একটানা ঝক ঝক শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছেন। জাহাজের ঝক ঝক শব্দের মধ্যে তলিয়ে গেছে বৃষ্টির ঝুপ ঝাপ শব্দটা।

বনহুর ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এলো বাইরে।

অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চললো পিছনে ডেকের দিকে।

কেউ যেন তাকে দেখে না ফেলে এইভাবে অতি সাবধানতার সঙ্গে আত্মগোপন করে চলেছে বনহুর।

ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরীর ক্যাবিনের সম্মুখে এসে থামলো।

দক্ষিণ হাতখানা প্যান্টের পকেটে প্রবেশ করিয়ে বের করে আনলো গুলীভরা রিভলভারখানা তারপর অতি দ্রুত প্রবেশ করলো ক্যাবিনের মধ্যে।

ক্যাবিনের মেঝে তখন দাঁড়িয়ে আছে জমকালো পোষাক পরা একটি মূর্তি।

বনহুরকে উদ্যত রিভলভার হাস্ত ক্যাবিনে প্রবেশ করতে দেখে আলখেল্লাধারীর চোখ দু'টো আগুনের ভাটার মত ধক করে জ্বলে উঠলো। মুহূর্ত বিলম্ব না করে ঝাপিয়ে পড়লো আলখেল্লাধারী বনহুরের উপর।

বনহুর চট করে সরে দাঁড়ালো এক পাশে।

অলখেল্লাধারী হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো ভূতলে।

বনহুর সেই দন্ডে চেপে বসলো আলখেল্লাধারীর বুকের উপর। বাম হস্তে টিপে ধরলো ওর গলা, দক্ষিণ হর্স্তে গুলীভরা রিভলভারখানা আলখেল্লাধালীর কণ্ঠনালীতে চেপে ধরে আলখেল্লাধারীকে কাবু করে ফেললো।

বনহুরের সঙ্গে পেরে উঠা সহজ ব্যাপার নয়।

বনহুরের বাম হাতখানা আলখেল্লাধারীর গলায় সাড়াশীর মত এটে বসলো।

বনহুর এবার দুই হাতে টিপে ধরলো ওরা গলা।

খানিকক্ষণ ছট্ ফট করে নীরব হয়ে গেলো আলখেল্লাধারীর দেহটা।

এবার বনহুর দ্রুতহস্তে আখেল্লাধারীর মুখের আবরণ উন্মোচন করে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—শয়তান, ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী সেজে খুব বাহাদুরী করছিলে।

এবার বনহুর দ্রুত হস্তে মৃত মুঙ্গেরীর শরীর থেকে ঐ ড্রেস খুলে নিয়ে নিজে পরে নিলো। ক্যাবিনের আয়নায় দাঁড়িয়ে দেখলো, না আর তাকে চিনবার কোন উপায় নেই।

বনহুর এবার রিভলভার পকেটে রেখে ক্যাবিনের একপাশে এগিয়ে গেলো। সম্মুখেই একটা চাকার আকারে জিনিস নজরে পড়লো তার। বনহুর দ্রুত চাকার মত জিনিসটায় চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা তক্তা খসে পড়লো। ভিতরে একটা খুপড়ীর মত কুঠি জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছে একটি লোক। মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, চোখ দুটো কোঠরাগত; বুকের হাড় ক'খানা যেন গোনা যাচ্ছে। বনহুর ভূতলে লুণ্ঠিত লোকটার পাশে হাটু গেড়ে বসে ক্ষিপ্রহস্তে ওর শরীরের বাধন মুক্ত করে দিলো। লোকটা ক্ষীণ কণ্ঠে বললো–পানি--

বনহুর পাশের ক্যাবিনে প্রবেশ করে এক গ্লাস পানি নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে গেলো লোকটার পাশে। হাতে দিয়ে বললো—খাও।

এক নিশ্বাসে গ্লাসের পানিটুকু পান করে বললো—শয়তান, কেনো তুমি আমাকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছো? আমাকে তার চেয়ে হত্যা করো।

বনহুর বুঝতে পারলো, আলখেল্লাধারী একে এই কুঠরিতে আটকে রেখে ভয়নাক কষ্ট দিয়েছে।

বনহুর লোকটাকে বললো এবার—আর তোমাকে কষ্ট দেবোন, তুমি মুক্ত।

লোকটা হাত—পায়ের বন্ধন মুক্ত হওয়ায় অনেকটা শান্তি পাচ্ছিলো। হাতে এবং পায় হাত বুলিয়ে বললো—সত্যি তুমি আমাকে মুক্ত করে দিলে?

হাঁ, ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী আপনি মুক্ত। আর সেই শয়তান নকল মুঙ্গেরীকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত দিয়েছি।

তাহলে তুমি—তুমি কে?

আমি দস্যু বনহুর।

দস্যু বনহুর।

হাঁ, ভয় পাবার কিছু নেই।

কিন্তু---

আমি এই মুহূর্তে জাহাজ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি।

তুমি ---চলে---যাচ্ছো? টেনে টেনে কথাটা বললেন মিঃ মুঙ্গেরী।

হাঁ বন্ধু। কথা শেষ করে বনহুর হাতঘড়িটার দিকে তাকালো—দুটো বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকী।

বনহুর জাহাজের পিছন ডেকে এসে দাঁড়ালো।

দেখতে পেলো, একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। আলখেল্লাপরা বনহুরকে দেখে সরে এলো দ্রুত গতিতে তারপর বললো—এতো বিলম্ব হলো কেন তোমার?

কণ্ঠস্বরে বনহুর চিনতে পারলো এটাই সেই বংশীবাদক—নূরীর নৃত্যকালে বাঁশী বাজাতো।

বনহুর চাপা কণ্ঠে বললো—হঠাৎ মিঃ সেন অজ্ঞান হয়ে পড়ায়---

তাহলে সিগারেটের বিষক্রিয়া এতোক্ষণে শুরু হলো?

হাঁ, সেই রকম মনে হচ্ছে।

বেটা ঘুঘু দেখেছিলো কিন্তু ফাঁদ দেখেনি। আমার পিছনে লেগেছিলো সে, লোভ–মেয়েটিকে হস্তগত করা।

আমারও সেই রকম মনে হয়েছিলো। আচ্ছা সর্দার--

হেসে উঠলো হরশঙ্কর—তুমি আবার সর্দার বলা শিখলে কবে থেকে?

আলখেল্লার মধ্যে বনহুর বিব্রত বোধ করলো। সর্বনাশ তার কথাটা তাহলে ভুল হয়েছে। তাড়াতাড়ি বললো বনহুর – আমি এখন থেকে সর্দার বলেই ডাকাবো।

কেনো হে, তুমি কি আমাকে সম্মান দেখাচ্ছো? পূর্বে যেমন হরশঙ্কর বলে ডাকতে তাই ডেকো। কিন্তু আর বিলম্ব নয়, সময় হয়ে এসেছে।

এদিকের সব কাজ ঠিকভাবে হয়ে গেছে তো? মানে ওকে বোটে উঠানো হয়েছে? কথাগুলো অতি সাবধানে বললো বনহুর।

হয়েছে। এদিকের সব কাজ শেষ–শুধু তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

তাহলে চলো বন্ধু।

আজ তোমাকে বেশ খুশী খুশী লাগছে কেশব। এমন না হলে চলে!

বললো আলখেল্লাধারী বনহুর—এতোক্ষণ মিঃ সেন হয়তো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

তাই বুঝি এতো আনন্দ?

হাঁ হরশঙ্কর কিন্তু এখন আমাদের জাহাজ ত্যাগ না করলেও চলতো। পথের কাঁটা দূর হলোতো?

এরি মধ্যে ভুলে গেলে সব কথা। আসছে পূর্ণিমায় আমার যোগিণী পূজা আছে। তার পূর্বে আমাকে আশ্রমে পৌঁছতে হবে। না হলে আমার যাদুর মায়াচক্র নষ্ট হয়ে যাবে।

তাহলে যাত্রা শুরু না করলেই পারতে হরশঙ্কর। কি দরকার ছিলো এ জাহাজে এসে?

হেসে উঠলো হরশঙ্কর— তুমি এমন হয়ে গেলে কবে থেকে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? জাহাজে আসার উদ্দেশ্যটাও ভুলে গেছো দেখছি।

ওঃ এবার সব মনে পড়েছে। চলো আর দেরী করা ঠিক নয়। 'মনে পড়ছে' বললো বটে বনহুর, কিন্তু কেনো শয়তান হরশঙ্কর এ জাহাজে আশ্রয় নিয়ে এতোদূর এসে আবার ফিরে যাচ্ছে—সেটা এখনও সে বুঝতে পারলোনা।

সেটা বুঝলো মোটর বোটে বসে।

হরশঙ্কর নিজে ইঞ্জিনে গিয়ে বসলো।

বোটের মধ্যে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে একটি নারীমূর্তি। বনহুর বুঝতে পারলো—নূরী ওটা। ওর দু'পাশে দুটি বলিষ্ঠকায় লোক বসে। আলখেল্লাধারী বনহুর বসলো এক পাশে।

মোটর বোটখানার তলায় স্তুপকার নানা ধরনের মূল্যবান সামগ্রী। স্যুটকেস, ব্যাগ, নানা রকমের আরও কত কি রয়েছে। বনহুর বুঝতে পারলো-এগুলি চুরি করার জন্যই শয়তান হরশঙ্কর এ জাহাজে আশ্রয় নিয়ে লোককে নাচ-গান শুনিয়ে মাতিয়ে রাখতো। আসল উদ্দেশ্য হলো এ সব লুটে নেওয়া।

বনহুর নীরবে বসে রইলো, এই মুহুর্তে সে এদের তিন জনাকে কাবু করে সাগরের জলে নিক্ষেপ করতে পারে কিন্তু তাহলে তার সব উদ্দেশ্য সফল হবেনা। নূরী এখন স্বাভাবিক জ্ঞানে নেই বিশেষ করে ওকে নিয়ে বড় অসুবিধা হবে—হয়তো হিতে বিপরীত হতে পারে। নূরী সাগরবক্ষে ঝাপিয়েও পড়তে পারে—কাজেই বনহুর নিশ্চুপ রইলো।

চলন্ত জাহাজের পিছনে উচ্ছল জলরাশির বুকে মোটর বোটখানা ছোট্ট একটা কুটোর মত দোল খাচ্ছিলো।

জাহাজ থেকে মোটর-বোটখানা খুলে নেওয়া হলো।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরপাক খেয়ে মোটর বোটখানা ছিটকে গেলো প্রায় এক শত গজ দূরে।

হরশঙ্কর কৌশলে ইঞ্জিন ঠিক রেখে ডুবু ডুবু মোটর বোট-খানাকে সামলে নিলো।

বনহুর অবাক না হয়ে পারলোনা, অতি দক্ষ শয়তান এটা –বুঝতে পারলো।

নূরী পড়তে যাচ্ছিলো, বনহুর নূরীকে ধরে ফেলেছিলো অতি সাবধানে। মোটর–বোটখানা সোজা হতেই বনহুর নূরীকে ছেড়ে দিলো ক্ষিপ্রগতিতে। অন্য কেউ লক্ষ্য করবার পূর্বেই সে একাজ করে ফেললো।

নূরী চীৎকার করেছিলো বটে, কিন্তু কিসের ভয়ে সে চীৎকার করেছিলো কেউ বুঝতে পারলোনা। মোটর-বোট ডুবে যাওয়ার ভয়ে না, আলখেল্লাধারী তাকে ধরে ফেলেছিলো সেই জন্যে। অন্য কেউ না বুঝলেও বনহুর বুঝতে পেরেছিলো—নূরী তাকেই দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো।

মোটর বোট থেকে লক্ষ্য করলো বনহুর, জাহাজখানা ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছে।

তীর বেগে ছুটে চলছে মোটর বোটখানা।

হরশঙ্কর দক্ষ মোটর–বোট চালকের মত বোটখানা চালিয়ে চলেছে।

এক সময় বললো হরশঙ্করের একজন অনুচর–গুরুদেব ভোর হবার পূর্বেই কি আমরা আশ্রমে পৌঁছতে সক্ষম হবো?

হাঁ মহন্ত হবো। বললো হরশঙ্কর।

অন্য একজন অনুচর বলে উঠলো—গুরুদেব, আমাদের বন্ধ্যা বন ছেড়ে মহানগর কত দূর ছিঁলো?

পুনরায় হরশংকর জবাব দিলো—হাজার হাজার মাইল দূরে। আমরা প্রায় এক সপ্তাহ কাল চলে মহানগরে পৌছেছিলাম। এ কথা নিশ্চয়ই তোমাদের স্মরণ আছে?

হাঁ গুরুদেব, আছে।

এবার বললো আলখেল্লাধারী বনহুর—হরশঙ্কর আমরা জাহাজে বন্ধ্যা বনের----

হাঁ কেশব, আমরা জাহাজে আমাদের বন্ধ্যা বনের অতি নিকটে এসে গেছি। ভোর হবার পূর্বেই আমরা আশ্রমে পৌঁছবো আশা করি।

হরশঙ্করের কথা সত্য হলো।

অবিরাম গতিতে মোটর বোটখানা চালিয়ে হরশঙ্কর ভোর হাবার কিছু পূর্বে বন্ধ্যা বনের ধারে এসে নেমে পড়লো।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো বনহুর। পথে দিনের আলো ফুটে উঠলো আত্মগোপন করায় অসুবিধা হতো তার।

হরশঙ্করের সঙ্গে এগিয়ে চললো তার অনুচরদ্বয় ও নূরী। পিছনে আলখেল্লাধারী বনহুর।

সুন্দর বনটা, কোথাও এতোটুকু আগাছা বা ঝোপঝাড় নেই। মনে হচ্ছে কেঁউ যেন গোটা বনটা পরিস্কার করে রেখেছে।

এই সেই বন।

যে বনে নূরী মনিকে নিয়ে প্রথম পদার্পণ করেছিলো, যে বনে সন্ন্যাসী বাবাজী তাকে আশ্রয় দিয়েছিলো এই সেই বন–বন্ধ্যা এর নাম।

বেশ কিছু দূর এগুনোর পর হরশঙ্কর পূর্বদিকে অগ্রসর হলো।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো অন্যান্য অনুচারগণ ও নূরী। অগত্যা বনহুরও দাঁড়িয়ে পড়লো।

হরশঙ্কর আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে গহণ বনের অন্তরালে অদৃশ্য হলো।

অনুচরদ্বয় নূরীসহ অগ্রসর হলো পশ্চিমে।

বনহুরও তাদেরকে অনুসরণ করলো।

❑

মনিরা সন্তানকে ফিরে পেয়ে খুশীর অন্ত নেই তার। এটাই যে তার নূর তাতে কোন সন্দেহ নেই। এক বছরের শিশু নূরকে যখন হারিয়েছিলো মনিরা তখন নূরের শিশু মুখ খানা আঁকা ছিলো মায়ের হৃদয়পটে। সেদিন খেলা দেখতে গিয়ে মনিরার কিছুমাত্র ভুল হয়নি নূরকে চিনতে।

এতো সহজেই মনিরার তার নূরকে পাবে কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। মনিরা ভেবেছিলে নূরকে কপালিক সন্ন্যাসিগণ হত্যা করে ফেলেছে আর কোনদিন তাকে ফিরে পাবে না। ঐ সুন্দর ফুটফুটে মুখখানা আর দেখতে পাবে না কোনদিন। কিন্তু সবই খোদার ইচ্ছা—তিনি কি না পারেন। তার ইচ্ছায় আজ মনিরা তার হারানো রত্ন ফিরে পেলো। হাজার হাজার শুকরিয়া করে মনিরা খোদার দরগায়।

শিশু নূরকে পেয়ে শুধু মনিরাই খুশী হয়নি, খুশী হয়েছেন মরিয়ম বেগম। তার সুপ্ত হৃদয়ে যেন আবার অনন্দের বান বয়ে চলছে। খুশীর অন্ত নেই। চৌধুরী বাড়ী বহুদিন পরে আবার শিশুর কলরবে মুখর হয়ে উঠেছে।

বৃদ্ধ সরকার সাহেবও আজ আনন্দে আত্মহারা।

চৌধুরী বাড়ীর সুখ–দুঃখের সঙ্গে তিনি যে নিবিড়ভাবে জড়ানো। এ বাড়ীতে যখন দুঃখ আর বেদনার ছায়া ঘনিয়ে আসে, বৃদ্ধ সরকার সাহেবের মন তখন ব্যথায় কুঁকড়ে যায়, মুখের সাদা হাস্যময় ভাব বিলুপ্ত হয় কোন অজানার অন্ধকারে। আবার যখন চৌধুরী বাড়ীতে খুশীর বান ডেকে যায়

তখন সরকার সাহেবের মুখে হাসি ফুটে উঠে আনন্দে তিনি ছোট্ট শিশুর মতই উৎফুল্ল হয়ে উঠেন।

নূরকে পেয়ে বৃদ্ধ সরকার সাহেব ছোট্ট শিশুর মতই আনন্দে মেতে উঠেন।

এতো সুখেও এ বাড়ীতে যেন এতোদিন কোন সুখ ছিলোনা। অভাব ছিলোনা কোন জিনিসের, তবু যেন সদা অভাব কিসের অনুভব করতো বাড়ীর সবাই।

সারাটা দিন চৌধুরী বাড়ীর হিসেব-নিকেশ নিয়ে এতোটুকু অবকাশ ছিলোনা সরকার সাহেবের—আজ এতো কাজের মধ্যেও প্রচুর সময় তিনি নূরকে নিয়ে কাটিয়ে দেন। নূরও সরকার সাহেবকে পেলে কোন কথা নেই, আনন্দে আত্মহারা হয় সে।

নূর সরকার সাহেবকে দাদু বলে ডাকে।

ড্রইংরুমে দাদু আর নাতি মিলে চলতো কত হাসি আর গল্প।

ভূত-প্রেত আর রাক্ষসের গল্প শুনতে ভালবাসতো নূর। যুদ্ধ আর লড়াইয়ের কথা শুনলে শিশু নূরের ধমনীর রক্ত যেন উষ্ণ হয়ে উঠতো।

সরকার সাহেবকে বলতো নূর-এসো দাদু, লড়াই করি।

হেসে বলতেন সরকার সাহেব—না দাদু, আমি তো বাঘ নই,যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে।

এসো না একটু দাদু।

নূর বৃদ্ধ সরকার সাহেবকে নাজেহাল ও পেরেশান করে তবে ছাড়তো।

বৃদ্ধ সরকার সাহেবকে হারিয়ে দিয়ে ছুটে যেতো নূর মায়ের পাশে—আম্মা আম্মা, আমি দাদুকে হারিয়ে দিয়েছি। দাদুকে হারিয়ে দিয়েছি।

মনিরা হাস্য উজ্জ্বল মুখে এগিয়ে আসে দু'হাতে নূরকে কোলে তুলে নিয়ে বলে—ছিঃ দাদুকে বুঝি হারিয়ে দিতে আছে।

ততক্ষণে বৃদ্ধ সরকার সাহেব এসে দাঁড়ান মা ও পুত্রের পাশে, মিষ্টি হেসে বলেন—মা মনিরা, তোমার ছেলে বড় হলে মস্ত একজন বীর পুরুষ হবে। এখন দাদুকে হারিয়ে দিয়ে জয়ী হয়েছে তখন হাজার হাজার সৈনিককে পরাজিত করে রাজ্যজয় করবেও।

হাসতো মনিরা।

মরিয়ম বেগমও এসে দাঁড়াতেন তাদের পাশে, তাঁর মুখেও তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠতো।

নূর মনিরার পাশে শুয়ে বলতো—আম্মা আমার কিন্তু আর একটা মাম্মা ছিলো ঠিক তোমার মত।

নূরের উপর থেকে যাদুকরের যাদুক্রিয়া দূর হয়ে যাওয়ায় এখন তার মনে পড়তো নূরীর কথা। মাঝে মাঝে নূরীর জন্য মন খারাপ হতো শিশু নূরের।

সেদিন মনিরা খোলা জানালার পাশে দুগ্ধ-ফেননিভ বিছানায় শুয়ে আছে কোলের কাছে নূর।

আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ হাসছে।

জোছনার আলো এসে পড়েছে মনিরা ও নূরের মুখে।

মনিরা নূরের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছে আর এক জনের কথা—যার দান এই অমূল্য রত্ন। না জানি সে আজ কোথায় কেমন আছে। বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে।

শিশু নূরের ছোট্ট সুন্দর ললাট থেকে কোঁকড়ানো চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে মনিরা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো। গন্ড বেয়ে গড়িয়ে এলো দু'ফোটা অশ্রু।

এমনি আরও বহুদিন মনিরা তার স্বামীর জন্য নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেছে। কিন্তু শিশু নূরের সম্মুখে সে কোন দিন চোখের পানি ফেলে নি। যতদূর সম্ভব মনিরা নিজকে সংযত করে রাখতো নূরের কাছে।

আজ মনিরার চোখে অশ্রু দেখে বললো নূর—আম্মা, তুমি কাঁদছো!

তাড়াতাড়ি চোখের পানি মুছে ফেলে বললো মনিরা–কই না তো। এমনি চোখে কুটো পড়েছিলো বাবা।

আম্মা, আমার কিন্তু আর একটা মাম্মা ছিলো ঠিক্ তোমার মত।

আমার মত?

হাঁ, মাম্মা সুন্দর গান জানতো। আমি না ঘুমোলে মাম্মা গান গেয়ে আমাকে ঘুম পাড়াতো।

আশ্চর্য হয়ে শোনে মনিরা, শিশু নূরকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলে সে–আচ্ছা নূর ---

দু'হাতে মনিরার গলা জড়িয়ে ধরে বলে নূর—আম্মা, তুমি আমাকে নূর বলে ডাকো কোনো? আমার নাম যে মনি, মাম্মা আমাকে মনি বলে ডাকতো।

অবাক হয়ে শুনতো মনিরা—কে সে নারী, যে তার সন্তানকে এতো স্নেহ-আদর দিয়ে মানুষ করেছে। ঐ শয়তান যাদুকরের সঙ্গে সে নারীর কি সম্বন্ধ কে জানে।

মনিরা বললো—বাপ, আমি তোমার নাম নূর রাখলাম। কেনো নূর নামটা তোমার ভাল লাগে না?

বেশ, তুমি আমাকে নূর বলে ডেকো আর মাম্মা আমাকে মনি বলে ডাকবে, আমার দুটো নাম হবে—কি সুন্দর, তাই না? তুমি নূর আর মাম্মা মনি--শুনো আম্মা, মাম্মা আমাকে অনেক ভালবাসতো।

আমি তোমাকে একটুও ভালবাসতে পারিনা তাই না?
তুমিও ভালবাসো। কিন্তু গান গাইতে জানো না, তাই--
তাই আমাকে ভাল লাগে না বুঝি?
আমার মাম্মার জন্য মন কেমন করছে।
শিশু নূর মুখখানা গম্ভীর বিষন্ন করে ফেললো।
মনিরা বুকে চেপে ধরে বললো–ওরে আমি যে তোর মা।
না, আমার মাম্মা আছে। আমি তার কাছে যাবো।
কোথায় আছে তোমার সেই মাম্মা?
জানি না।
তা হলে কি করে যাবে তার কাছে?
আমি বুঝি কোন দিন মাম্মার কাছে যেতে পারবো না?
পারবে। তোমার মাম্মা আসবে।
আমাকে নিতে?
মনিরা শিউরে উঠে, জবাব দিতে পারে না।
নূর মায়ের মুখে হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে বলে–মাম্মা আমাকে কবে নিতে আসবে আম্মা বলো?
আসবে। তুমি এখন ঘুমোও নূর।
না,আমার চোখে ঘুম আসছেনা।
গান গাইলে ঘুমাবে?
তুমি গান গাইতে জানো আম্মা?
একটু একটু জানি বাপ।
তবে গাও--আমি ঘুমোবো আম্মা। নূর চোখ বন্ধ করে।
মনিরা নূরের গায়ে মৃদু মৃদু দোলা দিয়ে গান ধরে। সুমিষ্ট মধুর সুরে গান মনিরা ঃ

আমার নূর ঘুমাবে
আকাশে চাঁদ হাসবে।
হাস্নাহেনার গন্ধ নিয়ে
সমীরণ ভাসবে।
তারার দল মিটি মিটি
চেয়ে চেয়ে দেখবে।
আমার নূর ঘুমাবে।

এতো সুন্দর সুরে গাইতে পারে তার আম্মা ভাবতেই পারেনি নূর, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে—তুমি এতো সুন্দর গান গাইতে জানো আম্মা! রোজ এমনি করে গান গাইবে—আমি ঘুমোবো।

আচ্ছা, তুমি ঘুমোও নূর, আমি গান গাইছি।

মনিরার গানের সুরে ঘুমিয়ে পড়ে নূর। মনিরা জোছনার আলোতে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে পুত্রের ঘুমন্ত ঘুমের দিকে।

ধীরে ধীরে আনমনা হয়ে যায় মনিরা তাকায় জোছনায় ভরা আকাশের দিকে। চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে বনহুরের মুখখানা। মনে পড়ে অতীতে বিলীন হয়ে যাওয়া কত স্মৃতি---স্বামীর বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে মনিরা। নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নেয় বনহুর ওকে মাথায় হাত বুলিয়ে ডাকে—মনিরা!

মনিরা মুখ তুলে তাকায় স্বামীর মুখের দিকে—বলো?

তুমি একি করলে মনিরা?

কেনো?

আমাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে তুমি ভুল করলে।

না, ভুল আমি করিনি। তোমাকে স্বামীরূপে পেয়ে আজ আমি ধন্য হয়েছি।

বনহুর মনিরার চিবুকটা তুলে ধরে—মনিরা।

মনিরা স্বামীর বুকে মুখ গুজে অনুভব করে স্বর্গের শান্তি।

সব কথা মনের পর্দায় ভেসে উঠে মনিরার। কোথায় গেলো তার জীবনের স্বর্গসুখ। কোথায় গেলো তার এতো খুশী এতো আনন্দ- হাসি- গান--

মনিরার বালিশ সিক্ত হয়ে উঠে চোখের পানিতে।

ঘুমন্ত নূরকে বুকে আঁকড়ে ধরে ডাকে মনিরা—বাপ আমার।

আকাশে চাঁদ তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে।

❑

বন্ধ্যার জঙ্গলে বনহুরকে ধরে রাখে এমন জন কেউ নেই। পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র জন্তু ছাড়া পেলে যেমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে তেমনি দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠলো বনহুর।

হরশঙ্করের দলের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করলো সে বন্ধ্যার জঙ্গলে।

গাছের ফল আর ঝর্ণার জল হলো বনহুরের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের একমাত্র সম্বল। দিনের আলোতে সে লুকিয়ে থাকে গাছের শাখার

অন্তরালে। রাতের অন্ধকারে নেমে আসে সে গহন বনের মধ্যে। চারিদিকে সর্তক দৃষ্টি নিয়ে বিচরণ করে বেড়ায় গোটা বনভূমি।

বনহুরের একমাত্র চিন্তা নূরীকে উদ্ধার করা।

কিন্তু যতক্ষণ নূরী তার স্বাভাবিক জ্ঞানে ফিরে না এসেছে ততক্ষণ বনহুর যেন নিরুপায় । নূরীকে জোর করে হরণ করতে পারে সে । পারলে কি হবে, তাকে নিয়ে এ বন ছেড়ে চলে যেতে হবে তো। চলে যাবার পথ কোথায়? বনপথে কিসে যাবে–ঘোড়া নেই। আর জল পথে যাওয়া যায় তবু নৌকা বা জলযানের প্রয়োজন।

বনহুর নূরীর উদ্ধার চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লো। সুযোগ খুঁজতে লাগলো–এই দলের নেতা হরশঙ্করকে হত্যা করবে নাহলে কোন উপায় নেই।

বনহুর দুষ্টজনকে হত্যা করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেনা। বরং আনন্দ লাভ করে।

বনহুর একদিন গভীর রাতে বন্ধ্যা বনের মধ্যে বিচরণ করে ফিরছিলো। অনেক সন্ধান করেও হরশঙ্করকে সে আজও আবিস্কার করতে সক্ষম হয়নি। আশ্চর্য হয়ে গেছে সে, লোকটা গেলো কোথায়।

গহন বনের মধ্যে একটা কাঠের তৈরী কুঠি নজরে পড়লো। বনহুর জঙ্গলে আত্মগোপন করে কুঠিখানার নিকটে পৌছলো। বিস্ময়ে আরষ্ট হলে বনহুর কুঠির ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলো—শুধু নূরী নয় অমনি আরও কতকগুলি যুবতীকে সেই কুঠিতে আটকে রাখা হয়েছে। যুবতীদের দেহে তেমন কোন বস্ত্র নেই প্রায় উলঙ্গের মত রয়েছে সবাই।

বনহুর লজ্জায় দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো।

আশ্চর্য, যুবতীগুলি যেন পাথরের মূর্তির মত চুপচাপ বসে আছে, কেমন এক তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব তাদের চোখে মুখে।

বনহুর নূরীর কথা স্মরণ করে আবার কুঠরীর মধ্যে তাকালো নূরীকে উদ্ধার করতে হলে লজ্জা তাকে বিসর্জন দিতে হবে।

বনহুর প্রতিটি নারীর উপর দৃষ্টি বুলিয়ে চললো। যদিও এটা তার অন্যায়, কোন পুরুষ নারীর যৌবন লুকিয়ে দেখা ঠিক নয়। বনহুরের দৃষ্টি হঠাৎ থেমে গেলো একটি যুবতীর উপর এই তো তার নূরী পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে আছে এক পাশে জড়োসড়ো হয়ে।

বনহুরের চোখে পানি এলো,তার চিরচঞ্চল নূরী কোনদিন এমনতো ছিলোনা। কি হয়েছে তার কেনই বা সে তার স্বাভাবিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

বনহুর যখন এই সব কথা ভাবছে ঠিক সেই মুহুর্তে কুঠির দরজা খুলে গেলো।

কুঠির মধ্যে প্রবেশ করলো হরশঙ্কর ও আরও দু'জন পুরুষ। কুঠির মধ্যভাগে একটি মশাল জ্বলছিলো। মশালের আলোতে বনহুর সব কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

হরশংকর কুঠির মধ্যে এসে দাঁড়ালো।

পিছনের একটি লোকের হাতে মস্তবড় একটি মাটির পাতিল। হরশঙ্কর ইংগিত করতেই পিছনের আর একজন লোক মাটির পাতিল হতে একটি গেলাসে তরল পদার্থ জাতীয় কিছু তুলে নিয়ে প্রতিটি মেয়ের মুখে ধরলো।

হরশংকর গুরুগম্ভীর কণ্ঠে গর্জে উঠলো—খাও।

যুবতী ভয় –কাতর চোখে তাকালো হরশঙ্করের দিকে। তারপর নিঃশব্দে পান করলো তরল পদার্থ।

বনহুর কাঠের ফাঁকে তখনও নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে।

হরশঙ্কর যমমূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। আর লোক দু'টি মাটির পাতিল থেকে তরল পদার্থ নিয়ে পান করাচ্ছে এফজনের পর একজনকে।

বনহুরের দু'চোখে বিস্ময় এবার বুঝতে পারলো সে –শয়তান হরশঙ্কর কোন মারাত্মক রস দ্বারা এ সব যুবতীকে সংজ্ঞাহারা করে রেখেছে। প্রতিদিন সে এইভাবে এদের ঐ রস খাওয়ায়। এবং ইচ্ছামত যাকে খুশী নিয়ে গিয়ে শহরে নাচ –গান দেখিয়ে পয়সা উপার্জন করে তৎসহ করে চুরি ডাকাতি এমনি আর কত কি। রাগে বনহুরের শরীর জ্বালা করে দু'চোখে তার আগুন ঠিকরে বের হয়।

বনহুর দেখলো, লোকটা এবার নূরীর দিকে গেলাস হাতে এগুচ্ছে।

বনহুর অধর দংশন করে।

লোকটা নূরীর মুখে গেলাস উঁচু করে ধরতেই বনহুরের রিভলবার থেকে একটা গুলী এসে বিদ্ধ হলো তার বুকে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো ভূতলে।

হরশংকর ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জন করে ছুটে গেলো কুঠিরের বাইরে।

বনহুর তখন অদৃশ্য হয়েছে।

এরপর হরশঙ্কর বুঝতে পারলো–শত্রু তার অতি নিকটে পৌঁছে গেছে। তার অনুচরগণকে জানিয়ে দিলো এ বনের চারিদিকে তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করতে।

হরশঙ্কর গহন বনে থাকলেও তার বিরাট একটা দল আছে। তার অনুচরগণ এক এক জন এক একটী নারী নিয়ে কেউ বা শিশুদের নিয়ে নানা রকমের যাদু খেলা দেখাতে দূর হতে দূর দেশে চলে যায়।

এই দোল পুর্নিমায় সবাই দূর দেশ থেকে ফিরে আসে বন্ধ্যার জঙ্গলে। হরশঙ্কর নরহত্যা করে দোল পূর্ণিমায় তার পূজা শেষ করে।

হরশঙ্করের অনুচরগণ সবাই এখন বন্ধ্যার জঙ্গলে রয়েছে। গুরুদেবের আদেশ পাওয়া মাত্র সবাই ছড়িয়ে পড়লো গোটা বনের মধ্যে। কে এই শত্রু, যার গুলীতে তাদের একজন নিহত হলো।

কেউ বা বল্লম, কেউ বা শরকী, দা, কুঠার, খর্গ–যে যা পারলো তাই নিয়ে চষে ফিরতে লাগলো বনভূমি।

কিন্তু কোথায় কাউকে খুঁজে পেলো না।

সন্ধ্যার পূর্বে সবাই হরশঙ্করের সম্মুখে হাজির হলো।

নত মস্তকে সবাই জানালো বনভূমি তারা চষে ফেলেছে কিন্তু কাউকে পাওয়া যায় নি।

একজন অনুচর এগিয়ে এলো–গুরুদেব আমি কাউকে খুঁজে না পেলেও এমন একটা জিনিস পেয়েছি যার দ্বারা বোঝা যায়–আমাদের এই বন্ধ্যা জঙ্গলে কোন--

কথা শেষ হয় না লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় মাটিতে। লোকটার বুকের রক্তে রাঙা হয়ে উঠে বন্ধ্যা জঙ্গলের শুকনো মাটি।

হরশঙ্কর ও অন্যান্য অনুচরগন শুনতে পেয়েছিলো একটা গুলীর শব্দ, পরক্ষণেই লোকটা পড়ে গিয়েছিলো ভূতলে।

হরশঙ্কর ইংগিত করলো অনুচরগণকে যেতে। কিন্তু কোন দিক থেকে গুলীটা এসেছিলো এটা কেউ বলতে পারলোনা। তবু সবাই বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে।

হরশঙ্কর এগিয়ে গেলো মৃতলোকটার দিকে, কি পেয়েছিলো। সে, যার জন্য তার মৃত্যু ঘটলো।

হরশঙ্কর ঝুকে পড়লো লোকটার হাতের উপর, দেখতে পেলো–একটা সিগারেটের টুকরা রয়েছে তার হাতের মুঠায়।

হরশঙ্কর মৃতের হাতের তালু থেকে সিগারেটের টুকরাটা তুলে নিয়ে হেসে উঠলো–হাঃ হাঃ হাঃ---হাঃ হাঃ হাঃ

❑

যাদুকর হরশঙ্করের দল যখন সমস্ত বন খুঁজে খুঁজে হয়রান পেরেশান তখন বনহুর সুউচ্চ এক ডালের ঘন পাতায় ফাঁকে হেলান দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসে মৃদু মৃদু হাসছে। একবার রিভলবারটা খুলে দেখে নিলো–মাত্র আর তিনটা গুলী অবশিষ্ট রয়েছে। ইচ্ছা করলে এ গুলী তিনটা দিয়ে তিন জনকে পর পারে পাঠাতে পারে কিন্তু এতো শীঘ্র রিক্তহস্ত হলে তার চলবেনা।

যতক্ষণ নূরীকে উদ্ধার করা না যায় ততক্ষণ তাকে এ গুলী ক'টি সাবধানে ব্যয় করতে হবে।

কিন্তু সেই দিনের পর থেকে আবার হরশঙ্কর উধাও হলো।

বনহুর আশ্চর্য হলো—লোকটা আবার গেলো কোথায়। যেখানেই থাক বনহুর, হরশঙ্করের উপর ছিলো তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বনহুর গাছের ডালে ডালে থেকে সর্তক অনুসন্ধান চালালো। এ মুহূর্তে নূরীকে উদ্ধার করা মোটেই কোন অসুবিধাজনক নয়। কিন্তু নূরীকে উদ্ধারের পূর্বে জানতে হবে—কে এই পাষন্ড নরপিশাচ? কোথায় এর বাস, কি উদ্দেশ্য এর?

বনহুর একদিন গাছের শাখায় বসে তাকাচ্ছিলো দূর হতে দূর–যত দূর তার দৃষ্টি যায়। হঠাৎ নজর তার চলে গেলো অদূরে এক বটবৃক্ষতলে এক সন্ন্যাসীর উপর।

চমকে উঠলো বনহুর—সন্ন্যাসী বাবাজী এই গহণ বনে!

বনহুরের চোখদু'টো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এই সমস্ত জঙ্গলে মহৎ ব্যক্তিও বাস করে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিলন আশায় উদগ্রীব হয়ে উঠলো বনহুর।

হঠাৎ বনহুর শুনতে পেলো একটা গুরুগম্ভীর কণ্ঠ— বৎস, এসো, আমি তোমার প্রতীক্ষায় পথে চেয়ে আছি।

বনহুর বিস্ময়ভরা চোখে তাকালো, তার এখানে উপস্থিতি সন্ন্যাসী বাবাজী জানলো কি করে। বনহুর বৃক্ষ শাখা ত্যাগ করে নেমে এলো নীচে।

সন্ন্যাসী বাবাজী বললো—বৎস তুমি ঐখানে উপবেশন করো।

বনহুর বসে পড়লো আদুরে একটা গাছের গুড়ির পাশে।

সন্ন্যাসী বললো–বৎস, জানি তুমি কিসের সন্ধানে আজ এই বন্ধ্যার জঙ্গলে এসেছো।

বনহুরের চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

কিন্তু বৎস, তুমি কোন সময় এ বনের পশ্চিম অংশে যাবে না।

বনহুর প্রশ্ন করলো—কেনো?

সন্নাসী বাবাজী বললো—ঐদিকে বিপদ আছে।

বিপদ!

হাঁ, মায়ারাণীর মায়াজালে জড়িয়ে পড়বে।

মায়ারাণীর মায়াজাল........হঠাৎ অট্টহাসিতে ভেংগে পড়লো বনহুর। মুহূর্ত বিলম্ব না করে সন্ন্যাসীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। রিভলভার চেপে ধরলো সন্ন্যাসীর কণ্ঠনালীতে।

কঠিন কণ্ঠে গর্জে উঠলো বনহুর—তুমি সন্ন্যাসী সেজে মায়ারাণীর মায়াজালে জড়িয়ে পড়ার ভয় দেখাচ্ছো হরশঙ্কর—জানো আমি কে?

সন্ন্যাসী বেশী হরশঙ্কর একটুও নড়লো না, চোখ দু'টো দিয়ে অগ্নি বর্ষণ করলো। বনহুর ওর দৃষ্টির দিকে তাকাতেই কেমন যেন অসুস্থ বোধ করলো, টলতে লাগলো তার পা দু'খানা। এতো তেজ হরশঙ্করের চোখে! বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে রিভলভার থেকে গুলী ছুঁড়লো।

একটা আর্তনাদ হলো মাত্র।

বনহুর অবাক হয়ে দেখলো—হরশঙ্কর যেমন বসে ছিল তেমনি রইলো। একটু সরলো না সে।

বনহুর এবার ভাল করে লক্ষ্য করতেই আশ্চর্য হলো, সন্ন্যাসী বেশী হরশংকরের দেহটা সম্পূর্ণ বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

বনহুর হাত দিয়ে নাড়া দিতে লাগলো, মনের মধ্যে সন্দেহ জাগলো—হরশঙ্কর না হয়ে যদি সত্যই কোন সন্ন্যাসী হয়, তা হলে একটা নিরপরাধ মহৎ জনকে খুন করার অপরাধে অপরাধী হবে সে। বনহুর দাড়ি ধরে টানতেই খসে এলো— জটাজুটসহ মাথার চুলও খুলে এলো তার হাতের মুঠায়। এবার বনহুর আশ্বস্ত হলো, তার অনুমান তা হলে মিথ্যে হয়নি। অহেতুক একটি মহৎ জীবন নামের অপরাধে অপরাধী নয় তবে সে।

বনহুর এবার হরশঙ্করের মাথা ধরে টেনে তুলে ফেললো। আশ্চর্য একটা খোলসের মধ্যে সে জমাটভাবে বসেছিলো। খোলসটা দেখলে ঠিক বটবৃক্ষের শিকড় বলে ভ্রম হয়, অতি কৌশলে এ খোলসটা সে তৈরী করেছিলো তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বনহুর হরশঙ্করকে এতো সহজে মৃত্যুবরণ করতে দেখে হতবাক হয়েছিলো। এবার বুঝতে পারলো—গাছের শিকড়ে তৈরী খোলসটা অত্যন্ত আঁটসাট, ওর মধ্যে প্রবেশ করলে কেউ নড়তে পারবে না। যতক্ষণ না ধীরে-সুস্থে সে পিছন দিয়ে বের হয়।

বনহুর খোলসটা নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলো।

হঠাৎ খোলসের ভিতরে এক জায়গায় নজর পড়তেই বিস্ময়ে আড়ষ্ট হলো। কতকগুলো কল-কজার মত জিনিস আঁটা রয়েছে। বনহুর একটা সুইচের মত জিনিসে চাপ দিতেই অকস্মাৎ ধূম্র রাশিতে ভরে উঠলো স্থানটা। অবাক হলো বনহুর। আর একটা চাকার মত জিনিস নজরে পড়লো তার। এবার সে ঐ চাকার মত জিনিসটায় হাত দিলো। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো। সম্মুখে একটা জায়গার মাটি সরে গেলো ধীরে ধীরে এক পাশে। বনহুর দ্রুত এগিয়ে গেলো, দেখলো একটি সুড়ঙ্গ পথ বেরিয়ে এসেছে।

বনহুর দ্রুত সেই সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করলো।

ভয় ভীতি বলতে কিছুই ছিলোনা তার। সুড়ঙ্গের ধাপে ধাপে পা রেখে সন্তর্পণে নীচে নামতে লাগলো। কিছুদূর এগুতেই বনহুরের শরীরে একটা গরম তাপ অনুভব করলো। আর একটু এগুতেই দেখতে পেলো একটা মেশিনের মত জিনিস অবিরাম চক্রাকারে ঘুরপাক খাচ্ছে। তারই একটা নল উঠে গেছে উপরের দিকে বনহুর বুঝতে পারলো—এই মেশিনটাই গভীর মাটির নীচে ধূম্র সৃষ্টি করছে, আর ঐ নলটা দিয়ে ধূম্র-রাশি উপরে উঠে যাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। হরশঙ্কর তার বটবৃক্ষের শিকড়ের খোলসের মধ্যে বসে এই সব যন্ত্র চালনা করতো। এটাই ছিলো মায়াজালের মায়াচক্র। এখান থেকে সৃষ্টি করতো সে নানা সময় না না অদ্ভূত জিনিস।

বনহুর আর বিলম্ব না করে দ্রুত সুড়ঙ্গ বেয়ে উঠে এলো উপরে, কিন্তু সুড়ঙ্গের বাইরে আসার সুযোগ তার হলো না, সঙ্গে সঙ্গে মাথায় প্রচণ্ড একটা আঘাত অনুভব করলো।

হরশঙ্করের কয়েকজন অনুচর দাঁড়িয়েছিলো সুড়ঙ্গ পথের মুখে, তারা গুরুদেবের মৃতদেহ বটবৃক্ষ তলায় পড়ে থাকতে দেখে বুঝতে পেরেছিলো—নিশ্চয়ই কোন অজ্ঞাত লোক গুরুদেবকে হত্যা করেছে এবং তারা দেখতে পেয়েছিলো, সুড়ঙ্গের মুখ খোলা, তাই পূর্ব হতেই প্রস্তুত ছিলো।

বনহুর অকস্মাৎ মস্তকে আঘাত পাওয়ায় টাল সামলাতে পারলো না, ঘুরপাক খেয়ে পড়ে গেলো নীচে।

তারপর যখন জ্ঞান ফিরলো অসহ্য, একটা চাপ অনুভব করলো নিজের বুকে। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো বনহুর, কিন্তু চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়লোনা। দক্ষিণ হাতখানা বুকের দিকে আনতেই বুঝতে পারলো—তার বুকের উপর বিরাট একখানা পাথর রাখা হয়েছে।

বনহুরের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। মাথায় হাত বুলাতেই হাতখানা ভিজে চুপসে উঠলো। কেমন চট্‌চটে মনে হলো, তবে কি তার মাথাটা কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়েছিলো!

বনহুর এবার বুকের উপর থেকে পাথরটা নামিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলো। অসমী শক্তির অধিকারী বনহুর। যদিও পাথরখণ্ডটা বিরাট বড় এবং ভয়ঙ্কর ভারী, তবু বনহুর অল্পক্ষণের মধ্যেই সেটা নামিয়ে ফেলতে সক্ষম হলো।

উঠে বসলো বনহুর, তাকালো চারিদিকে।

জমাট অন্ধকার।

একটা শব্দ কানে ভেসে আসছে বনহুরের। ভাল করে লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলো—এটা সেই সুড়ঙ্গর মধ্যের মেশিন-কক্ষ। এতোক্ষণ সে ঐ মেশিন-কক্ষের মেঝেই শুয়েছিলো।

উঠে দাঁড়ালো বনহুর।

অতি সাবধানে এগুতে লাগলো, হঠাৎ যদি ঐ ঘূর্ণিয়মান মেশিনটায় গিয়ে পড়ে তাহলে তার দেহটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তাই বনহুর যে দিকে থেকে শব্দটা আসছিলো সেদিক না এগিয়ে অপর দিকে এগুতে লাগলো।

বনহুর আন্দাজেই বুঝে নিলো, সুড়ঙ্গ মুখটা তখন কোন্ দিকে ছিলো। অল্প সময়ে সুড়ঙ্গ মুখ আবিষ্কার করে নিলো সে। এবার বনহুর এগুতে লাগলো সুড়ঙ্গ পথে, কিন্তু সুড়ঙ্গ মুখ বন্ধ থাকায় বের হতে পারলো না।

সুড়ঙ্গ পথটা অত্যন্ত সংকীর্ণ ও চাপা হওয়ায় কয়েক বার মাথায় আঘাত পেলো বনহুর। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। একটা ভ্যাপসা গন্ধে তার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো।

বনহুর বাইরে বের হবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো।

অসহ্য লাগছে, বেশীক্ষণ এভাবে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হলে মৃত্যু তার অনিবার্য।

বনহুর সুড়ঙ্গ পথের দেয়াল হাতড়ে দেখতে লাগলো ভিতর থেকে। বাইরে বের হবার কোন উপায় আছে কিনা। কিন্তু আর যেন দাঁড়াতে পারছে না, নিশ্বাস নিতে ভয়ংকর কষ্ট হচ্ছে। তবু অনেক কষ্টে দেয়াল হাতড়ে চললো বনহুর।

এই বুঝি তার জীবনের শেষ পরিণতি!

এক অন্ধকার সুড়ঙ্গ মধ্যে ছিলো দস্যু বনহুরের মৃত্যু!

বসে পড়লো বনহুর,খুব কষ্ট হচ্ছে তার।

সমস্ত শরীর ঘেমে নেয়ে উঠেছে। হাঁপাচ্ছে সে। তবু অনেক কষ্টে আবার উঠে দাঁড়ালো, মৃত্যুর পূর্বে আর একবার শেষ চেষ্টা করবে সে।

কিন্তু দাঁড়াতে পাড়লো না বনহুর, পা দু'খানা শিথিল হয়ে আসছে। পড়ে গেলো হুমড়ি খেয়ে......

এখানে বনহুর যখন মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকলো— মা.......

ঠিক্ সেই মুহূর্তে মরিয়ম বেগম ফজরের নামাজান্তে খোদার নিকটে হাত তুলে মোনাজাত করছিলেন— হে দয়াময়, পাক্-পরওয়ারদেগার, তুমি আমার মনিরকে সুস্থ সবল রেখো। যেখানেই থাক সে, তাকে তুমি রক্ষা করো, দেখো প্রভু।

মায়ের এ প্রার্থনা খোদা কবুল করলেন।

বনহুর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েও বুক দিয়ে এগুতে লাগলো। হঠাৎ তার হাতে একটা লম্বা হ্যাণ্ডেলের মত কিছু লাগলো বলে মনে হলো তার।

বনহুর প্রাণ পণ চেষ্টায় হ্যাণ্ডেলের মত জিনিসটা ধরে টান দিলো—সঙ্গে সঙ্গে সুড়ঙ্গ মুখ থেকে একটা বিরাট কিছু সরে যাচ্ছে বলে অনুভব করলো। একট ঝাপসা আলোর রশ্মি সুড়ঙ্গ পথে নেমে এলো নীচে।

বনহুর এতোক্ষণে বাঁচবার ভরসা পেলো। বুঝতে পারলো—ঐ হ্যাণ্ডেলটা অন্য কিছু নয়, সুড়ঙ্গ মুখের আবরণ উন্মোচন করার একটি যন্ত্র।

এবার বনহুর হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও বা বুকে চলে সুড়ঙ্গ-মুখের বাইরে এসে পৌঁছলো।

প্রাণভরে নিশ্বাস নিলো বনহুর।

তারপর উঠে দাঁড়ালো, কপাল বেয়ে তখনও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। হাতের পিঠে গড়িয়ে পড়া রক্ত মুছে নিয়ে ফিরে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো, দু'জন যমদূতের মত বলিষ্ঠ লোক বর্শা হাতে ছুটে আসছে তাকে দেখতে পেয়ে।

বনহুর মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে নিলো।

মুক্ত বাতাসে প্রাণভরে নিশ্বাস নিয়ে সে আবার পূর্ব শক্তি সঞ্চয় করে নিতে পেরেছে।

ভয়ঙ্কর লোক দু'টো তীর বেগে ছুটে আসছে।

বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, পালাবার জন সে নয়। দাঁড়িয়ে থেকে মৃত্যুকে বরণ করবে, নয় ওদেরকে পরাজিত করবে।

লোক দু'টি বর্শা উঁচিয়ে ছুটে এলো।

বনহুর সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে উবু হয়ে শুয়ে পড়লো।

অমনি লোকদু'টি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো ভূতলে।

বনহুর মুর্হূত বিলম্ব না করে একজন ভূতলশায়ী লোকের হাত থেকে বর্শা কেড়ে নিয়ে সজোরে বসিয়ে দিলো তার বুকে।

তীব্র আর্তনাদ করে লোকটা মুখ বিকৃত করে ফেললো।

অন্য একজন সে ধড়মড় করে উঠে রুখে এলো বনহুরের দিকে। কিন্তু বনহুরের সঙ্গে পেরে উঠা তার একার কাজ নয়। লোকটা যখন এগুলো অমনি বনহুরের বর্শা বিদ্ধ হলো তার বুকে।

বনহুর এক ঝটকায় লোকটার বুক থেকে বর্শা উচিয়ে নিতেই হুমড়ি খেয়ে লোকটা পড়ে গেলো ভূতলে,ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো।

আর এক দণ্ড বিলম্ব না করে বনহুর বর্শা হাতেই ছুটলো বনের পশ্চিমাংশে।

কাঠ দিয়ে তৈরী সেই কুটির নিকটে পৌঁছে হতবাক হলো। কাঠের তৈরী কুটিরখানা শূন্য পড়ে রয়েছে—কুঠরিতে একটি জনপ্রাণী নেই।

বনহুর হতভম্ব হলো, এতোগুলি নারী সব গেলো কোথায়? কোথায়ই বা নূরী, বনহুরের মাথায় যেন আকাশ ভেংগে পড়লো। নূরীকে বুঝি পেয়েও আবার হারালো সে।

ক্ষুধায় পিপাসায় অত্যন্ত কাতর বনহুর।

প্রথমে তার এতোটুকু পিপাসা নিবারণের প্রয়োজন।

বনহুর চারিদিকে লক্ষ্য করে দ্রুত এগুতে লাগলো বনের মধ্যে পাহাড়িয়া নদীটার দিকে।

এতো বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো বনহুর, আর হাটতে পারছেনা—তবু চললো সে।

নদীটার নিকটবর্তী হয়ে বনহুর হাটু গেড়ে বসে পড়লো।

সচ্ছ সাবলীল জলধারা কল কল করে ছুটে চলেছে। বনহুর আজলা ভরে পানি তুলে নিয়ে পান করলো। একটা অনাবিল তৃপ্তি বনহুরের সমস্ত দেহ মনকে ভরিয়ে দিলো। প্রাণ ভরে সুশীতল পানি পান করলো সে।

এমন সময় হঠাৎ একটা ঝুপ্ ঝাপ শব্দ কানে ভেসে এলো বনহুরের। ফিরে তাকালো আচম্বিতে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো বনহুর। অদূরে নদীবক্ষে একটা মোটর-বোট দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই একটা লোক একটি যুবতীকে মোটর-বোটটায় তুলে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে।

বনহুর তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো—লোকটা যুবতীকে টেনে হিচড়ে মোটর-বোটে উঠিয়ে নিলো।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুর ছুটলো সেই দিকে।

যুবতী যেই হোক তাকে নিশ্চয়ই কোন শয়তান জোরপূর্বক হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে।

বনহুর প্রাণপণে ছুটলো।

লোকটা তখন যুবতীর হাত পা মজবুত করে বাঁধছিলো।

যুবতী হাত পা ছোড়াছুড়ি করায় বাঁধতে বিলম্ব হচ্ছিল তার।

হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলো লোকটা।

বনহুরকে ছুটে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি ইঞ্জিনের পাশে গিয়ে বসেলো; যেমন ষ্টার্ট দিতে যাবে, অমনি বনহুর ব্যাঘ্রের মত ঝাপিয়ে পড়লো মোটর-বোট খানার উপরে।

বলিষ্ট মুষ্ঠিতে চেপে ধরলো লোকটার গলা।

লোকটাও কম শক্তিশালী নয়, সেও দু'হাত দিয়ে নিজকে বাঁচিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো।

শুরু হলো ভীষণ ধস্তাধস্তি।

একবার বনহুর পড়ে যাচ্ছে নীচে, লোকটা চেপে বসছে তার বুকে। আবার লোকটা নীচে পড়ে যাচ্ছে, বনহুর উঠে বসছে ওর বুকে। চললো সেকি অদ্ভূত লড়াই।

কিন্তু বনহুরের সঙ্গে পেরে উঠা সেকি যার তার কর্ম!

দৃঢ় মুষ্ঠিতে বনহুর টিপে ধরলো লোকটার গলা। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চাপ দিতে লাগলো।

একটা গোঙ্গানীর শব্দ বেরিয়ে এলো লোকটার মুখ থেকে। পরক্ষণেই তাজা লাল টকটকে রক্ত গড়িয়ে পড়লো মোটর-বোট খানার মেঝেয়। কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে নীরব হয়ে গেলো লোকটার দেহ।

বনহুর এবার উঠে দাঁড়ালো লোকটার বুক থেকে, তারপর যুবতীর দিকে ফিরে তাকাতেই বিস্মিত হলো, যুবতী অন্য কেহ নয়—নূরী। আনন্দে বনহুরের চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

নূরী তখন বনহুরের দিকে অপরিচিতের মত তাকিয়ে আছে।

বনহুর দ্রুত এগিয়ে এলো নূরীর নিকটে, আবেগ ভরা কণ্ঠে ডাকলো— নূরী!

নূরী ভীতভাবে তাকিয়ে বললো, না না আমি তোমাকে চিনি নে। কে তুমি?

নূরী, আমি তোমার হুর—তোমার সাথী।

না না, আমার মনে পড়ে না তোমার কথা। তোমাকে আমি কোন দিন দেখি নি।

অস্ফুট ধ্বনি করে উঠে বনহুর—নূরী। দু'হাতে ওকে টেনে নিতে যায় কাছে।

ঠিক সেই সময় অদূরে শোনা যায় অনেকগুলি লোকের চীৎকার— পালালো—পালালো ধরে ফেলো—ধরে ফেলো...........

বনহুর দেখলো বনের মধ্যে থেকে বর্শা আর বল্লম হাতে তীর বেগে ছুটে আসছে অগণিত লোক।

বনহুর দ্রুত হস্তে মৃত দেহটাকে পানিতে নিক্ষেপ করে ইঞ্জিনে ষ্টার্ট দিলো।

একটা শব্দ করে মোটর-বোটখানা তীর বেগে ছুটতে শুরু করলো।

ততক্ষণে নদী তীরে অসংখ্য শয়তান বদমাইশের দল বল্লম আর বর্শা হাতে এসে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ মোটর-বোট লক্ষ্য করে বল্লম আর বর্শা ছুঁড়ে মারতে লাগলো।

কেউ কেউ নদীবক্ষে ঝাপিয়ে পড়ে মোটর-বোটখানা ধরতে গেলো। কিন্তু বনহুরের হস্তে বোটখানা উল্কা বেগে ছুটে চলেছে।

একটা বর্শা ছিটকে এসে পড়লো মোটর-বোর্টের উপরে। ভাগ্যিস, বনহুরের পিঠে বিদ্ধ না হয়ে হলো ঠিক পাশে, মোটর-বোটের তক্তায়।

বনহুর একবার ফিরে তাকিয়ে দেখি নিলো মাত্র, তারপর অতি দ্রুত চালাতে লাগলো মোটর-বোটখানা।

ক্রমে শয়তান লোকগুলির কলকণ্ঠ আর চিৎকার মিশে এলো। আর দেখা যাচ্ছেনা ওদের। বনহুর এবার তার মোটর-বোটের গতি স্বাভাবিক করে নিলো।

কিন্তু এখনও বন্ধ্যা বন শেষ না হওয়া পর্যন্ত বনহুর নিশ্চিন্ত নয়!

মাঝে মাঝে বনহুর নূরীর দিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলো।

বোটের একটি আসনে চুপটি করে বসে আছে সে। চুল-গুলি এলোমেলো, চোখ দু'টিতে কেমন অসহায়ার দৃষ্টি। মুখ-মণ্ডল বিষন্ন মলিন।

বনহুরের মায়া হচ্ছিলো নূরীর দিকে তাকিয়ে।

হাস্যময়ী নূরীর একি অবস্থা হয়েছে।

বনহুর কোনদিন কল্পনাও করেনি, নূরীকে সে এইভাবে দেখবে।

অবিরাম গতিতে প্রায় কয়েক ঘন্টা চালানোর পর বন্ধ্যা বনের বাইরে এসে পৌঁছলো বনহুরের মোটর-বোটখানা। এবার চারিদিকে শুধু ফাঁকা, দু'ধারে সমতল ভূমির মধ্যে মাঝে মাঝে দু'একটা ঝোপঝাড় ও টিলা দেখা যাচ্ছে।

এখানে নদীটা পূর্বের চেয়ে অনেকটা প্রশস্ত। গভীরও বেশ মনে হচ্ছে। স্রোতও রয়েছে খুব।

মোটর-বোটখানা যেন আপন মনে ছুটতে শুরু করলো।

একি! বনহুর চমকে উঠলো, বনহুর বাধ্য হয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলো, তবু তীরবেগে মোটর-বোটখানা ছুটে চলেছে।

বনহুর মোটর-বোটখানার মোড় ফেরাতে চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু কিছুতেই বাগে আনতে সক্ষম হচ্ছেনা সে। বনহুর এবার বুঝতে পারলো— কোন নীচু জলপ্রপাতের সঙ্গে এ নদীটার যোগাযোগ রয়েছে। পাহাড়িয়া নদী—অসম্ভব কিছু নেই।

বনহুর ভীত হলো—সত্যই যদি তাই হয়, এই জলধারা যদি কোন উচু স্থান থেকে গভীর নীচে গিয়ে আছড়ে পড়ে তাহলে উপায়! মৃত্যুছাড়া কোন পথ নেই।

কিন্তু এতো করে বেঁচে আসার পর মরতে হবে!

বনহুর সম্মুখের খরস্রোত জলধারার দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে লাগলো।

নূরীও তখন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে। সেও বুঝতে পারছে, তাদের মোটর-বোটখানা কোন বিপদের মুখে ছুটে যাচ্ছে। আজ যদি নূরীর পূর্বের কথা স্মরণ থাকতো তাহলে তার মনে ভেসে উঠতো আর একদিনের কথা। যেদিন নূরী মৃতবৎ শিশু মনিকে নিয়ে নৌকার মধ্যে এমনি এক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলো।

আজ নূরী সম্পূর্ণ অতীতকে বিস্মৃত হয়েছে।

যাদুকর হরশঙ্কর তাকে এমন একটা ঔষধ খাইয়ে দিয়েছে যার জন্য নূরী কিছুতেই পূর্ব কথা স্মরণ করতে সক্ষম হচ্ছিলো না।

নূরী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছিলো শুধু। বুঝতে পারছিলো, বিপদ তাদের ঘনিয়ে আসছে।

বনহুর আর নূরীর মোটর-বোট আজ যেদিক ছুটে চলেছে, একদিন ঐ পথেই নূরী আর মনিসহ নৌকাখানা ছুটে চলেছিলো। ভাগ্য সেদিন প্রসন্ন ছিলো, তাই নৌকাখানা আটকে গিয়েছিলো দু'টি পাথর খণ্ডের সঙ্গে। আর আজ ঠিক্ তার অপর দিক দিয়ে বনহুর আর নূরীর নৌকা দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে।

আর বেশী নয়, প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরেই সেই ভীষণ জলপ্রপাত। হাজার হাজার ফিট্ নীচে আছড়ে পড়ছে খরস্রোত নদীটা।

বনহুর আর নূরী মৃত্যুর জন্য যেন প্রতীক্ষা করছে। নদীবক্ষে এবার মাঝে মাঝে পাথরখণ্ড দেখা যাচ্ছে। বনহুর আতঙ্কিত হলো, হঠাৎ যদি ওর একটা পাথরের সঙ্গে তাদের মোটর-বোট খানা ধাক্কা খায় তাহলে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে বোট-খানা, সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবস্থাও হবে মর্মবিদারক।

বনহুর আর নূরীর মোটর বোট অতি অল্পক্ষণে সেই ভয়ঙ্কর জলপ্রপাতের নিকটবর্তী হয়ে পড়লো।

শিউরে উঠলো বনহুর।

তার সাহসী প্রাণও কেঁপে উঠলো। মুর্হূত বিলম্ব না করে নূরীকে নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লো নদীবক্ষে।

প্রচণ্ড জলোচ্ছাসে সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেলো উভয়ে।

বনহুর নূরীকে দৃঢ় হস্তে ধরে রাখলো অতি সাবধানে।

কিন্তু কিছুতেই বনহুর নিজকে স্থির রাখতে পারছেনা। খরস্রোতে ভেসে যাচ্ছে ওরা দু'জনা।

নূরীও মরিয়া হয়ে ধরে আছে বনহুরকে।

সেকি দারুণ অবস্থা, একবার ডুবছে, একবার উঠছে, কখনও ভেসে যাচ্ছে। অদূরেই জলপ্রপাত।

হাজার হাজার ফিট্ নীচে আছড়ে পড়ছে পানিগুলো।

বনহুর আর নূরী মোটর-বোট থেকে নদীবক্ষে লাফিয়ে পড়তেই বোটখানা তীর বেগে ছুটে গেলো, পরক্ষণেই হাজার ফিট্ নীচে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো।

বনহুর আর নূরী ঝাপটা ঝাপটি করছে।

দু'জন দু'জনাকে আঁকড়ে ধরে আছে প্রাণপণে।

তবু ভেসে ভেসে গড়িয়ে যাচ্ছে ওরা, কিছুতেই আর রক্ষা নেই। হঠাৎ বনহুর সম্মুখে একটা পাথর পেয়ে আঁকড়ে ধরলো। প্রথম হাত ফস্‌কে গেলো, এই হয়েছিলো আর কি, আবার বনহুর এটে ধরলো পাথরটা। কোনরকমে নূরীকে নিয়ে পাথরটার উপরে চড়ে বসলো বনহুর।

রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে।

নূরীর শরীরের ওড়নাখানা কখন যে ভেসে গেছে স্রোতের টানে। শুধু ঘাড় আর একটা আট-সাট ব্লাউজ রয়েছে তার শরীরে।

বনহুর তাকালো এবার নূরীর দিকে।

নূরী নিজের ভিজে চুপ্‌সে যাওয়া শরীরের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় কুঁকড়ে যাচ্ছিলো।

এতা বিপদেও বনহুরের হাসি পেলো। এখনই মৃত্যু যার অনিবার্য ছিলো তার আবার এতো লজ্জা।

বনহুর নিজের গা থেকে জামাটা খুলে এগিয়ে ধরলো-নাও।

নূরী দ্রুত হস্তে বনহুরের হাত থেকে জামাটা নিয়ে নিজের যৌবন ভরা শরীরে চাপা দিলো।

মাথার উপরে অসীম আকাশ।

নীচে যমদূতের মত জলোচ্ছাস।

সামান্য একটা পাথরখণ্ডে উপবিষ্ট দু'টি প্রাণ।

ভয়ঙ্কর বিপদের গভীর বেদান ভরা মুহূর্তেও বনহুর নূরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো—নূরী, এখনও তুমি আমাকে চিনতে পারছোনা? আমি কে?

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ালো নূরী, বললো—না।

নূরী! ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলো বনহুর।

নূরী দু'চোখের ভীতি আর উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো নূরীর পাশে।

প্রচণ্ড প্রচণ্ড ঢেউগুলি আছাড় খেয়ে পড়ছে পাথরটার গায়ে। উচ্ছ্বসিত জলরাশি বনহুর আর নূরীর শরীরকেও বার বার ভিজিয়ে দিচ্ছিলো। যে কোন মুহূর্তে তারা গড়িয়ে পড়তে পারে এই অশান্ত জলস্রোতের মধ্যে। তখন কোন উপায় থাকবে না রক্ষার।

বনহুর নূরীকে ঐ ভীষণ জলপ্রপাতের দিকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—হঠাৎ যদি পড়ে যাও তাহলে ঐ হাজার ফিট্ নীচে গড়িয়ে পড়বে।

শিউরে উঠে নূরী।

সেই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড ঢেউ আছড়ে পড়ে তাদের গায়ে।

নূরী ভয়-বিবর্ণ মুখে আঁকড়ে ধরে বনহুরকে।

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে টেনে নেয় কাছে।

বনহুরের প্রশস্ত বুকের মধ্যে নিজকে নির্ভয়শীলা মনে করে নূরী।

কিন্তু চোখে-মুখে তখনও তার অপরিচিতার ভাব। নূরী এখনও চিনতে পারেনি বনহুরকে।

গোটা বেলা কেটে গেলো, কতক্ষণ এইভাবে সামান্য একটা পাথরখণ্ডে বসে কাটানো যায়। সম্মুখে মৃত্যুদূত দাঁড়িয়ে। যে কোন দণ্ডে গড়িয়ে পড়লে আর নিস্তার নেই।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

অস্তমিত সূর্যের রশ্মি এসে পড়লো বনহুর আর নূরীর মুখে। সন্ধ্যা হবার আর বেশী বিলম্ব নেই। বনহুরের ললাট কুঞ্চিত হয়ে উঠলো—এখন উপায়? যতক্ষণ না এই স্থান থেকে তীরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে, ততক্ষণ বাঁচবার কোনও ভরসাই নেই তাদের।

বার বার ঢেউ এর উচ্ছ্বাসিত জলরাশিতে বনহুর আর নূরীর দেহ স্কি হয়ে উঠছিলো। তার সঙ্গে ছিলো দমকা হাওয়া—নূরীর শরীরে কাঁপন ধরে গেলো।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এলো।

চারিদিকে শুধু জলোচ্ছ্বসের প্রচণ্ড শব্দ

বনহুর আর নূরী উভয়ে উভয়েকে আঁকড়ে ধরে বসে রইলো—এতোটুকু নড়লে বা গড়িয়ে পড়লে মৃত্যু অনিবার্য।

সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘন জমাট হয়ে উঠলো।

এখন কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছেনা। মৃত্যুর বিভীষিকা যেন মহাকালবেগে গ্রাস করতে আসছে বনহুর আর নূরীকে।

যার দৃষ্টির কাছে নূরী কিছু সময় আগেও লজ্জায় জড়ো-সড়ো হয়ে পড়ছিলো, যাকে সে বিশ্বাস করতে পারছিলোনা, এক্ষণে তারই বুকের মধ্যে খুঁজে নিয়েছে সে আশ্রয়।

বনহুর সজাগ ভাবে নূরীকে ধরে রাখলো।

এতোটুকু শিথিলতা এলেই নূরীকে হারাবে সে। রাত্রি বেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নূরী ঝিমিয়ে পড়েছে। বনহুর বুঝতে পারলো, এতো বিপদের মধ্যেও তার দু'চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে। কিছুতেই নূরী নিজকে জাগিয়ে রাখতে পারছে না।

এক সময় নূরীর দেহটা ঘুমে এলিয়ে পড়লো।

বনহুর অতি সাবধানে ধরে রাখলো ওকে।

❑

ভোরের আলো ফুটে উঠার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠলো নূরী। তাকালো চোখ মেলে। ফুটন্ত গোলাপ কুঁড়ির মত দু'টো আঁখির পাতা মেলে ধরলো বনহুরের মুখের দিকে। এতোক্ষণে যেন লজ্জা আর সঙ্কোচ এসে তাকে সঙ্কুচিত করে তুললো। তাড়াতাড়ি সরে বসতে গেলো নূরী।

বনহুরের নিদ্রাহীন চোখ দু'টিতে ফুটে উঠলো অপরূপ এক দৃষ্টি, এক টুকরা হাসি দেখা দিলো তার ঠোঁটের কোণে। নূরীর গালে মৃদু চাপ দিয়ে বললো—নড়লেই ছিটকে পড়বে, আর রক্ষা থাকবে না।

নূরী ছুটে আসা ঢেউগুলির দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলো।

বনহুর নূরীর ভয়-বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে বললো —ভয় নেই নূরী। আমি তোমাকে মরতে দেবোনা।

পূর্ব আকাশ রাঙা করে তখন উষার কিরণ ফুটে উঠেছে।

বনহুর ভাবতে লাগলো, কি করে এই মরণ-বিভীষিকা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। দিনের পর দিন এখানে প্রতীক্ষা করলেও কোন নাবিক বা কোন জলযানের সাক্ষাতের সম্ভাবনা নেই। ক্ষুধায় কাতর তারা, ভাগ্য পানিটা লবণাক্ত নয়—তাই রক্ষা। যখন উচ্ছ্বাসিত ঢেউগুলি আছড়ে পড়ে তাদের গায়ে এবং আশে পাশে, তখন নূরী আর বনহুর আজলা ভরে পান করে সেই পানি। কিন্তু শুধু পানি পান করে কতক্ষণ এই পাথরটার উপরে বেঁচে থাক্কা যাবে!

যতই বেলা বেড়ে উঠছে, বনহুর ততই বিষন্ন মলিন হয়ে পড়ছে—আর বুঝি রক্ষার কোন উপায় নেই। দেহের শক্তিও ক্রমান্বয়ে শিথিল হয়ে আসছে যেন। বেঁচে থাকার যে উদ্দীপনা, সব যেন নিভে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। বনহুর যখন উদ্ধারের কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছে না, ঠিক তখন দূরে একটা মস্ত বড়

কালো মত কিছু যেন এদিকে ভেসে আসছে বলে মনে হলো তার। বনহুর ভাল করে লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলো—বিরাট একটা গাছ গড়িয়ে ভেসে আসছে। ধ্বসে পড়া তীরস্থ কোন বটবৃক্ষ বা ঐ ধরনের কোন বৃক্ষ হবে।

এতো বেশী স্রোতের টানেও অতি ধীরে ধীরে গাছটা গড়িয়ে আসছে। বনহুর বুঝতে পারলো—গাছটা ছোট খাটো বা পাতলা কোন গাছ নয়—অত্যন্ত ভারী এবং বৃহৎ বৃক্ষ।'

বনহুর তাকিয়ে দেখলো, আশেপাশে—তাদের পাথরটার অদূরে আরও কতকগুলি বড় বড় পাথর জলস্রোতের মধ্যে কচ্ছপের পিঠের মত উঁচু হয়ে আছে। আশায় আনন্দে ওর চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কারণ, ঐ বিরাট গাছটা যদি কোনক্রমে তাদের এতোদূর এসে পড়ে তাহলে আর সামনে গড়িয়ে যেতে পারবে না। অনেকগুলি বড় বড় পাথর তার পথে বাধার সৃষ্টি করবে।

বিপুল আগ্রহ নিয়ে বনহুর তাকিয়ে রইলো গাছটার দিকে।

ধীরে ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে আসছে গাছটা?।

বনহুর নূরীকে আঁকড়ে ধরে বললো—নূরী, এবার আমরা বাঁচবো। ঐ গাছটা আমাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসছে।

নূরী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো, কোন জবাব দিলো না।

নূরীর জবাবের প্রতীক্ষা না করে বনহুর আবার তাকালো গাছটার দিকে।

অনেক এগিয়ে এসেছে গাছটা।

হটাৎ একটা পাথরখণ্ডে গাছটা আটকে গেছে বলে মনে হলো বনহুরের, কারণ আর এগুচ্ছে না গাছটা।

বনহুরের গোটা মন হতাশায় ভরে উঠলো। হায়, এবার উপায়–গাছটা আর এগিয়ে আসতে সক্ষম হবে না। পাথরটার সঙ্গে আটকে গেছে গাছটা।

কিন্তু এখনও উচ্ছ্বাসিত ঢেউএর আঘাতে দোল খাচ্ছে গাছটা। কোন ক্রমে পাথরটা গা থেকে ছাড়া পেলেই চলে আসতো তাদের দিকে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বনহুরের আশা পূর্ণ হলো, ঢেউএর আঘাতে গাছটা খসে এলো পাথরটার গা থেকে।

বনহুর আনন্দ ধ্বনি করে উঠলো—সাবাস!

এবার গাছটা বেশ দ্রুত গতিতে এগুচ্ছে। স্রোতের টান এদিকে আরও শতগুণ বেশী।

ভীষণ বেগে ছুটে আসছে এবার গাছটা।

কিন্তু যে ভাবে আসছে, হঠাৎ পাথরটার গায়ে ধাক্কা খেয়ে তারা দু'জনা ছিটকে না পড়ে।

বনহুর নূরীকে শক্ত করে এটে ধরলো, গাছটার ধাক্কা বা আঘাতে তারা যেন বিছিন্ন হয়ে না পড়ে।

এসে গেছে, অতি নিকটে এসে পড়েছে গাছটা।

যা ভেবেছিলো বনহুর, গাছটা তীরবেগে ছুটে এসে ঝাপটা খেয়ে আটকে পড়লো কয়েকটা পাথরখণ্ডের সঙ্গে।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি বা ঐ রকম কিছুর আশা করেছিল বনহুর—কিন্তু আশ্চর্য, এতোটুক ঝাকুনি বা কোন রকম অসুবিধা হলোনা তাদের।

গাছটা সম্পূর্ণ আড়াআড়িভাবে লম্বা হয়ে আটকে পড়লো। এবার আর কোন জলস্রোতেই তাকে ভাসিয়ে নিতে সক্ষম হবে না। কোনদিনই গাছটা ঐ হাজার ফিট জলপ্রপাতের নীচে পাথরের উপর আছড়ে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবেনা অনেকগুলি পাথরের গায়ে আটকে পড়েছে গাছটা।

বনহুরের চোখে-মুখে খুশীর উৎস।

এ ভাবে যে তাদের উদ্ধারের পথ হয়ে যাবে, কল্পনাও করতে পারেনি সে।

এবার বনহুর আর নূরী উঠে দাঁড়ালো, তাদের পাশেই গাছটার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে আছে। বিরাট গাছ, প্রায় বিশ-পঁচিশ গজ লম্বা হবে। পুরোনো বটবৃক্ষ এটা। গাছটার গুড়ি প্রায় তীরের সন্নিকটে পৌছে গেছে। হাত কয়েক দূরেই তীর ভূমি।

বনহুর নূরীকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, বললো বনহুর—নূরী, আমি তোমাকে ধরছি, তুমি দক্ষিণ হস্তে গাছটার ডাল ধরে গুড়িটার উপরে উঠে পড়ো। সাবধান, কোন সময় শাখা ছেড়ে দেবে না।

নূরী মাথা কাৎ করে জানালো—আচ্ছা।

❑

অনেক কষ্টে গাছটার শেষ সীমান্তে এসে উপস্থিত হলো বনহুর আর নূরী। গাছটা ঢেউ এর চাপে দুলছে, সাবধানে এগুতে হয়েছে তাদের। নূরীকে বনহুর অতি কৌশলে ধরে ধীরে এতোদূর নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এখন উপায়, এখনও তীর প্রায় পাঁচ ছ'হাত দূরে। বনহুর একা হলে চিন্তা ছিলোনা, সে অতি কৌশলে সাঁতার কেটে এই জায়গাটুকু পার হয়ে আসতে পারতো। কিন্তু নূরীকে নিয়ে কি ভাবে এই ভয়ঙ্কর খরস্রোত পার হবে।

বনহুর যেন বিপদে পড়লো।

কিন্তু কোন উপায় নেই, সাঁতার দিয়ে এই জায়গাটুকু পার হতেই হবে।

বনহুর নূরীকে বললো—নূরী, হয় জীবন ফিরে পাবো, নয় মৃত্যু। চলো—

অস্ফুট কণ্ঠে বললো নূরী— কোথায়?

এতো দুঃখেও বনহুরের মুখে হাসি ফুটলো, বললো সে— ঐ নদীবক্ষে।

ভয়ে নূরী বনহুরকে আঁকড়ে ধরলো।

বনহুর আর বিলম্ব না করে বললো—নূরী, আমাকে শক্ত করে ধরে রেখো, কোন রকমেই যেন তোমার হাত খসে না যায়। ধরো আমার গলা.....

নূরী বনহুরের গলা জড়িয়ে ধরলো শক্ত করে।

বনহুর লাফিয়ে পড়লো ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাত ভেসে গেলো দূরে, সেই মৃত্যুর মুখের দিকে, কিছুদূরেই জলপ্রপাত।

বনহুর প্রাণপণ চেষ্টায় সাঁতার কাটতে লাগলো।

তবু কিছুতেই স্রোতের অপর দিকে এগুতে সক্ষম হচ্ছেনা।

নূরীর হাত দু'খানা ক্রমে শিথিল হয়ে আসছে। আর রক্ষা নেই। এমন সময় বনহুর যেন পায়ে মাটির ছোয়া পেলো।

অতি কষ্টে, অতি সাবধানে বনহুর তীরে উঠে আসতে সক্ষম হলো।

কিন্তু নূরী তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

ক্ষুধা তৃষ্ণার কাতর নূরী, তারপর এই প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের বেগে কিছুতেই স্থির থাকতে পারলোনা, অজ্ঞান হয়ে পড়লো।

বনহুর যতই শক্তিশালী পুরুষই হোক, তবু মানুষতো।

তার অবস্থাও নাজেহাল হয়ে পড়েছে। কিন্তু সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েনি। নূরীর জ্ঞান ফেরানোর জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করতে লাগলো।

এতোটুকু সান্ত্বনা এখন বনহুরের বুকে—তারা তীরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। মস্ত একটা বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে বনহুর আর নূরী।

ঘন্টা কয়েক পরে জ্ঞান ফিরে এলো নূরীর।

বনহুরের মুখে খুশী ফুটে উঠলো।

নূরীকে নিবিড় ভাবে টেনে নিতে গেলো বনহুর কিন্তু নূরী ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো। অস্ফুট কণ্ঠে বললো—আমাকে ছেড়ে দাও, নইলে ঐ জলস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়বো।

বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো—নূরী।

নূরী রাগে অধর দংশন করে বললো—তোমাকে আমি চিনিনা।

নূরী।

আমাকে তুমি যেতে দাও।

কোথায় যাবে?
নূরী আনমনা হয়ে যায়, গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করে।
বনহুর বলে—তাহলে যাও।
নূরী নতমুখে বসে থাকে।
বনহুর পুনরায় বলে উঠে—তুমি স্মরণ করো নূরী, মনে করতে চেষ্টা করো....... সেই কান্দাই বন, সেই ভূগর্ভে আস্তানা, তোমার বনহুর.... মনে পড়ে? নূরী, কোথায় তোমার সেই মনি? নূরী—নূরী, কি হয়েছে তোমার? বনহুর দু'হাতে নিজের মাথার চুল টানতে থাকে, অধর দংশন করে সে।
নূরী বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবে, কি যেন সব এলোমেলো হয়ে যায়, স্মরণ হয় না কিছু। অনেক চিন্তা করেও নূরী মনে করতে পারেনা ওর কথাগুলো।

❑

গাছের ফল পেড়ে বনহুর নূরীকে দেয়—খাও।
নূরী নিজে খায়, ভাবে লোকটা তাকে সত্যি কত স্নেহ করে—ভালবাসে।
বনহুর নূরীকে খেতে দিয়ে নিজে চুপ চাপ বসে থাকে বিমর্ষ মুখে।
নূরী দুঃখ পায়, সে খাচ্ছে অথচ লেকাটা খাচ্ছেনা। ব্যথা পায় হৃদয়ে। একটা ফল হাতে তুলে নিয়ে বনহুরের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে—তুমি খাও।
বনহুর ফিরে তাকায় নূরীর দিকে, অফুরন্ত একটা আনন্দ নাড়া দিয়ে যায় তার মনে। নূরীর হাত থেকে ফলটা নিয়ে খায় বনহুর।
একটা গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর ঘুমিয়ে পড়ে বনহুর। আজ দু'দিন তার চোখে এতোটুকু ঘুম নেই।
নূরী বসে থাকে তার পাশে।
বনহুরের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নূরী নিষ্পলক নয়নে। এর পূর্বে কোথাও তাকে দেখে ছিলো কিনা স্মরণ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতে ওর মনে পড়ে না কোন কথা।
নূরীর মায়া হয়—লোকটা তার জন্য কতইনা কষ্ট করেছে তাকে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবন বিনষ্ট করতেও সে কুণ্ঠা বোধ করছিলোনা। নূরী এগিয়ে আসে, বনহুরের মাথাটা ধীরে ধীরে তুলে নেয় নিজের কোলে।

বনহুর গভীর ঘুমে মগ্ন থাকলেও সতর্ক ছিলো। একটু মাথায় হাত লাগতেই জেগে উঠলো, কিন্তু সে চোখ মেললো না। ঘুমের ভান করে চোখ বন্ধ করে রইলো।

নূরী ধীরে ধীরে বনহুরের চুলগুলি আংগুল দিয়ে আঁচড়ে দেওয়ার মত ঠিক্ করে দিতে লাগলো অতি যত্ন সহকারে বেশ কিছুক্ষণ এই কাজ করলো নূরী।

বনহুর হঠাৎ উঠে বসলো।

নূরী লজ্জায় মরিয়া হয়ে মাথা নত করলো।

বনহুর বললো—এতে লজ্জার কি আছে। সত্যি তুমি কত সুন্দর নূরী!

নূরী আরও জড়োসড়ো হয়ে পড়লো।

বনহুর নূরীর চিবুক ধরে উচু করে তুলে বললো—আমাকে তোমার কেমন লাগে?

নূরী নীরব রইলো, কোন জবাব দিলোনা।

বনহুর নূরীর দক্ষিণ হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে আবেগ ভরা কণ্ঠে বললো—নূরী, জবাব দাও? জবাব দাও?

নূরী পাথরের মূর্তির মতই নিশ্চুপ বসে রইলো।

বনহুর হঠাৎ প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিলো নূরীর গালে।

নূরী তবু স্থিরভাবে যেমন বসেছিলো তেমনি রইলো।

বনহুর নূরীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের হাতখানাকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলতে লাগলো, হঠাৎ এ— সে কি করে বসলো। নূরীকে সে আঘাত করলো! বনহুর নিজের হাতখানাকে মাটিতে আছড়াতে লাগলো।

নূরী ধরে ফেললো বনহুরকে।

বনহুর স্থির দৃষ্টি নিয়ে তাকালো নূরীর দিকে, একি নূরীর চোখে পানি নেই। এতোটুকু বিচলিত হয়নি সে।

বনহুর দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো ছোট্ট বালকের মত।

নূরী অবাক হয়ে দেখছে তার দিকে।

❑

বনহুর নূরীকে যতই স্মরণ করাতে চেষ্টা করছে, ততই নূরী যেন কিছুই বুঝতে পারছেনা। বনহুর যতই পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে, ওকে নিবিড়ভাবে পেতে চায়, নূরী ততই সরে যায় দূরে, সঙ্কুচিতভাবে নিজকে সরিয়ে রাখে বনহুরের পাশ থেকে।

কিন্তু রাতের বেলায় হয় যত মুস্কিল।

গহন বন। অন্ধকার রাত্রি, চারিদিকে হিংস্র জন্তুর গর্জন। নূরী ভয়ে কাঁপতে থাকে, তখন জড়োসড়ো ভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে বনহুরের কাছে।

অন্ধকারে নূরীর গতি বিধি লক্ষ্য করে হাসে বনহুর।

এমনি করে কেটে যায় দু'টি দিন আর দু'টি রাত।

নূরী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে এসেছে। বনহুর এবার বুঝতে পারলো— নূরীর হাটতে এখন কোন কষ্ট হবেনা!

নদীর ধার ধরে বনহুর আর নূরী এগিয়ে চললো।

সমস্ত দিন একটানা চলার পর ক্লান্ত অবশ পা দু'খানা আর যেন উঠতে চায়না তাদের। বনহুর যদিও তেমন কোন অসুবিধা বোধ করছেনা তবু নূরীর জন্য তাকেও ধীরে ধীরে চলতে হচ্ছিলো বা বনহুর নূরীকে হাত ধরে চলায় সাহায্য করছিলো।

গোটা দিন অবিরাম চলে এমন একস্থানে এসে তারা পৌঁছলো যেখানে নদীটা প্রশস্ত হয়ে সাগরে গিয়ে মিশেছে। তীর থেকে সম্মুখে তাকালে শুধু জল আর জল। আকাশ যেন মিশে গেছে ঐ সাগরবক্ষে।

বনহুর নূরীকে লক্ষ্য করে বললো—নূরী, আমরা সাগর তীরে এসে গেছি। হয়তো কোন জাহাজ এই পথে এসে যেতে পারে, তাহলেই আমরা বাঁচবো।

নূরীর কণ্ঠ শুকিয়ে এসেছে।

এ কয়টা দিন একমাত্র গাছের জংলী ফল খেয়ে বেঁচে আছে তারা। পানি পান করবার সুযোগ হয়নি আর।

নূরীর ক্লান্ত অবসন্ন করুণ মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে বললো বনহুর— তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না নূরী?

নূরী মাথা নীচু করলো।

বনহুর বুঝতে পারলো—নূরীর আর চলবার শক্তি নেই। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো বনহুর— কোথাও গাছ-পালা বা কোন ছায়া নেই, ফল-মূল তো দূরের কথা।

বনহুর নিজের জন্য যতখানি চিন্তিত না হলো, তার চেয়ে বেশী হলো নূরীর জন্য। নূরীকে আর বুঝি রক্ষা করা যাবে না।

নূরী বালির উপর বসে পড়লো।

বনহুর তাড়াতাড়ি নূরীর পাশে হাটু গেড়ে বললো—খুব কষ্ট হচ্ছে?

হাঁ, আমি আর পারছিনা।

নূরী, কি করবো বলো?

নূরী নীরব আঁখি দু'টি তুলে ধরলো বনহুরের মুখের দিকে।

বেলা শেষ হয়ে এসেছে।

সূর্যের আলোক-রশ্মি স্তিমিত হয়ে আসছে।

শুভ্র বলাকার দল ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে দূর হতে দূরান্তে।

বনহুর বললো—নূরী, ঐ পাখীগুলির আশ্রয় আছে। তারাও সন্ধ্যার আগে ফিরে যাচ্ছে নিজ নিজ ঘরে আর আমরা......... আমাদের কোন আশ্রয় নেই, নেই কোন মাথা লুকোবার ঠাঁই। কোথায় যাই বলো?

নূরী নীরব।

অসহ্য লাগে বনহুরের কাছে নূরীর এ নীরবতা। ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা করে তার। কিন্তু কি হবে কেঁদে, তার কাঁদা নূরীর প্রাণে এতোটুকু দোলা জাগাবেনা।

ঐ রাত্রি বালির মধ্যেই কেটে গেলো বনহুর আর নূরীর।

পরদিন আবার হলো তাদের যাত্রা শুরু।

এবার বনহুর আর নূরী সাগর তীরে ধরে এগিয়ে চললো। যদিও নূরী অবসন্ন ক্লান্ত তবু বনহুরের হাত ধরে অতি কষ্টে এগুতে লাগলো।

চলেছে তো চলেছে।

কিন্তু নূরী আর পারছে না, বসে পড়লো ভূতলে।

বনহুর বিপদে পড়লো, বুঝতে পারলো—নূরী একেবারে ক্ষীণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। চলতে আর পারছেনা—এখন উপায়!

না চললেও নয়, যতক্ষণ নিশ্বাস আছে ততক্ষণ বাঁচার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতেই হবে।

বনহুর নূরীকে তুলে নিলো হাতের উপরে।

নূরী লেতিয়ে পড়লো, আর বাধা বা আপত্তি করতে পারলো না।

বেশ কিছুদূর এগুলো বনহুর নূরীকে ঐ ভাবে দু'হাতের উপর তুলে নিয়ে। হঠাৎ বনহুরের নজরে পড়লো, দূরে—কিছু দূরে দু'টি লোক বালির উপরে ভীষণভাবে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে।

নূরীকে নিয়ে থমকে দাঁড়ালো বনহুর। ভাল করে লক্ষ্য করতেই চমকে উঠলো, একটি লোকের হস্তে সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা—অপর ব্যক্তি নিরস্ত্র। ছোরাওয়ালা লোকটার কবল থেকে স্যুটপ্যান্ট পরা লোকটা নিজেকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি চলেছে। আশেপাশে বেশ কিছুটা ঝোপঝাড় রয়েছে।

বনহুর বুঝতে পারলো—কোন অসহায় ভদ্রলোক কোন দস্যু কবলে আক্রান্ত হয়েছে। বনহুরের ধমনীর রক্ত মুহূর্তে উষ্ণ হয়ে উঠলো, যদিও সে আজ ক'দিন সম্পূর্ণ উপবাসী—তবু এতোটুকু বিচলিত হলোনা। নূরীকে বালির উপর নামিয়ে দিয়ে দ্রুত ছুটে চললো সে লোক দু'টির দিকে।

বনহুরের লক্ষ্য আর কোন দিকে নেই, সোজা সে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো লোক দু'টির উপরে। ছোরাওয়ালা লোকটার নাকে প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিতেই, চারিদিক থেকে বেরিয়ে এলো কতকগুলো স্যুট-প্যান্ট-ক্যাপ পরা লোক, একসঙ্গে সবাই বলে উঠলো—আহা একি করছেন'? একি করছেন'?

বনহুর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকালো—এ কি! তার চারপাশে অনেকগুলি ভদ্রলোক গোলাকার হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অদূরে তাকাতেই বনহুরের মাথাটা লজ্জায় নুয়ে এলো। একি করেছে সে! কিছুদূরে একটা ঝোপের পাশে ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক মোটা মত ভদ্রলোক, মুখে-চোখে তার বিরক্তির ছাপ।

ভীড় ঠেলে বনহুরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন পরিচালক স্বয়ং, গম্ভীর শান্ত কণ্ঠে বললেন—আপনি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন, আমাদের 'কুন্তিবাঈ' ছবির সুটিং হচ্ছিলো।

বনহুর হেসে বললো—মাফ করবেন—না জেনে.....

নিশ্চয়ই'? কিন্তু আপনি কে'?

অন্যান্য সবাই তখন বিপুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে, কে এই লোক—নির্জন সাগর সৈকতে এলোই বা কোথা থেকে। যে লোকটার নাকে বনহুর প্রচণ্ড ঘুষি লাগিয়ে দিয়েছিলো, তার নাক দিয়ে তখন রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। লোকটা বারবার রুমালে গড়িয়ে পড়া রক্ত মুছে নিচ্ছিলো।

পরিচালকের প্রশ্নের জবাবে একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিলো বনহুর—জাহাজডুবিতে আমাদের এই অবস্থা হয়েছে। কোন রকমে আমি ও আমার বোন প্রাণে বেঁচে গেছি। কান্দাই শহরে আমার বাড়ী।

পরিচালক উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন—কান্দাই শহরে আপনার বাড়ী? আপনার পরিচয়'?

জনাব হায়দার উদ্দিন চৌধুরীর সন্তান আমি। আমার নাম মকছুদ চৌধুরী।

বনহুর কান্দাই এর সবচেয়ে ধনি ব্ল্যাক মার্কেটার হায়দার চৌধুরীর সন্তান বলে নিজকে পরিচিত করলো।

পরিচালক খুশী হয়ে বললেন—আমাদের বাড়ী বসুন্দা নগরে। যদিও কান্দাই থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে, তবু কান্দাই এর সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট যোগাযোগ রয়েছে। জনাব হায়দার উদ্দিন চৌধুরীর নাম শুনেছি। তিনি মস্ত ধনবান ব্যক্তি—একথাও আমরা জানি। আপনি তারই পুত্র.............পরিচালকের গলা ব্যথায় জড়িয়ে এলো।

বনহুর বলে উঠলো—হাঁ, আজ আমারই এ দশা............

দুঃখ করবেন না, সবই অদৃষ্ট। কই, আপনার ভগ্নি কোথায়?

বনহুর দূরে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—ঐ যে ওখানে। আজ ক'দিন আমি এবং আমার ভগ্নি সম্পূর্ণ উপবাসী। ওর খুব কষ্ট হচ্ছে।

পরিচালক বনহুরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—আপনাদের আর কোন চিন্তা নেই। এবার আমাদের হাতে আপনারা এসে গেছেন। তারপর নিজেদের লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন—এসো, আগে এনাদের ব্যবস্থা ঠিক্ করে তবে আবার সুটিং শুরু করবো।

অদূরে একটা বাঁকের মত জায়গায় 'কুন্তিবাঈ' ছবির ইউনিটের জাহাজ নোঙ্গর করে ছিলো। ছোট ছোট কয়েকখানা বোটনৌকা ছিলো তাদের সঙ্গে, বনহুর আর নূরীকে নিয়ে পরিচালক নাহার সাহেব তাদের জাহাজে গেলেন। এবং বনহুর আর নূরীর জন্য একটা ক্যাবিন ছেড়ে দিলেন। থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থা তিনি নিজে করলেন। বনহুর ও নূরীর জামা-কাপড় নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, এসবও তিনি সংগ্রহ করে দিলেন। জাহাজে এসব জিনিসের কোন অভাব ছিলো না।

'কুন্তিবাঈ' এর নায়িকা জ্যোছনা রায় ও তার সহচরী অনেক যুবতীই ছিলো এই জাহাজে, কাজেই নূরীকে পেয়ে তারা খুশীই হলো।

বনহুর যখন বাথরুম থেকে বের হলো তখন তাকে রাজ পুত্রের মতই সুন্দর লাগছিলো।

পরিচালক নাহার চৌধুরী জড়িয়ে ধরলেন বনহুরকে, বনহুরের অপরূপ সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করে ফেললো।

এতোক্ষণ বনহুরের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ থাকায় তার সত্যিকারের রূপ ঢাকা পড়েছিলো, এখন সেভ করে নতুন পোষাক পরায় তাকে অপরূপ দেখাচ্ছে।

'কুন্তিবাঈ' ছবির সুপুরুষ নায়ক অরুণ সেন বনহুরের দীপ্ত চেহারার কাছে সঙ্কুচিত হলো। সে মনে করতো, তার চেয়ে সুন্দর সুপুরুষ আর বুঝি কেউ নেই। হিংসা হলো অরুণ সেনের মনে, সকলের অলক্ষ্যে তাকালো অরুণ সেন জ্যোছনা রায়ের দিকে।

অদূরে দাঁড়িয়ে জ্যোছনা রায় তখন নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে।

পরিচালক অরুণ সেন ও জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন বনহুরের।

আমার ছবির নায়িকা জ্যোছনা রায়।

হাত জুড়ে নমস্কার জানালো জ্যোছনা রায়।

আর ইনি নায়ক অরুণ কুমার সেন।

বনহুর অরুণের দিকে হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডসেক করলো।

বৈকালে বাকী সুটিং শেষ করে 'কুন্তিবাঈ' ছবির ইউনিট যাত্রা শুরু করলো।

হঠাৎ বনহুরের ভাগ্য এতো প্রসন্ন হবে, ভাবতেও পারেনি সে নিজে। মৃত্যুর মুখ থেকে যেন ফিরে এলো তারা।

পরিচালক নাহার চৌধুরী বনহুরের সঙ্গে গভীরভাবে ভাব জমিয়ে ফেললেন। এমন একজন ব্যক্তি যদি তাদের দলে থাকে তবে তাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। নাহার চৌধুরী জানেন—কান্দাই এর হায়দার উদ্দিন চৌধুরী বিরাট ধনবান, ইচ্ছা করলে তিনি এক সঙ্গে পাঁচখানা ছবির প্রযোজনা করতে পারেন। আর এমন সুন্দর সুপুরুষ তার ছেলে, হিরো বাইরে খুঁজতে হবে কেনো। কিন্তু বড় বেরসিক ভদ্রলোক, এতো অর্থের মালিক হয়েও এ ব্যবসায় দৃষ্টি দেন না।

পথে আরও একটা দৃশ্যের সুটিং শেষ করে তবেই ফিরবেন পরিচালক। একটা ঘোড়দৌড়ের দৃশ্য নেওয়া হবে। কিন্তু সেই দৃশ্যটা এমন স্থানে হতে হবে যেখান বেশ ফাঁকা বিস্তৃত মাঠ ও কিছুটা পাহাড় রয়েছে, আরও থাকতে হবে কিছু ঝোপ-ঝাড়-টিলা। এই দৃশ্যটা নেওয়া হলেই 'কুন্তিবাঈ' ছবির ইউনিট স্বদেশে ফিরে যাবে।

জাহাজখানা তীরের অনতিদূর দিয়ে এগুতে লাগলো। ডেকে দাঁড়িয়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্র চোখে লাগিয়ে দেখছেন পরিচালক স্বয়ং। ক্যামেরাম্যান অনন্ত বাবুও মাঝে মাঝে পরিচালকের হাত থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা নিয়ে দেখছিলেন।

কিন্তু মনমতো জায়গা কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। যদি পাওয়া যায় সুন্দর বালুকাময় বিস্তৃত প্রান্তর, আশেপাশে কোথাও টিলা বা পাহাড়ের চিহ্ন নেই আবার যদি পাওয়া যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়, আশেপাশে কোন ফাঁকা মাঠ বা বিস্তৃত প্রান্তর নেই। গোটা দু'টো দিন মনমতো জায়গার অভাবে কেটে গেলো 'কুন্তিবাঈ' ইউনিটের।

জাহাজ আজ দক্ষিণ পূর্ব কোণ ধরে এগুচ্ছে।

পরিচালক নাহার চৌধুরী দুরবীক্ষণ যন্ত্র চোখে লাগিয়ে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। হঠাৎ একদিন জুটে গেলো তার মনমতো জায়গা।

তীরের অনতিদূরে জাহাজ নোঙ্গর করলো।

ঠিক পরিচালকের মনের মত স্থান। খুশীতে আত্মহারা হলেন নাহার চৌধুরী। জাহাজ থেকে বোট নামানো হলো, সবাই বোটে চেপে তীরে এলেন।

পরিচালকের আনন্দ আর ধরছেনা।

যেমনটি চেয়েছিলেন ঠিক্ তেমনটিই নাকি পেয়েছেন।

বিস্তৃত বালুকাময় বেলাভূমি, মাছে মাঝে ছোট ছোট টিলা আর ঝোপঝাড়। একটু দূরেই ছোটখাটো কয়েকখানা পাহাড়।

সুটিং শুরু করবেন পরিচালক।

জাহাজ থেকে দু'টো ঘোড়া নামিয়ে আনা হলো। একটি সাদা ধবধবে, একটি সাদা-কালো মেশানো! ঘোড়া দু'টি যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি তেজী।

জায়গা বেছে নিয়ে ক্যামেরা বসানো হলো।

নায়িকা জ্যোছনা রায়কে মেকআপ দিচ্ছেন মল্লিক বাবু।

এ দৃশ্যে থাকবে নায়িকা, নায়ক ও ভিলেন।

নায়ক অরুণ কুমার ও ভিলেন নায়ক বিশুর মেকআপ নেওয়া হয়ে গেছে। এ দৃশ্যে থাকবে......

নায়িকা কলসী কাঁখে জল নিয়ে ফিরছিলো।

একটা ঘোড়ার পিঠে হঠাৎ এগিয়ে এলো ভিলেন। রাজার সেনাপতির বেশ—চোখে মুখে লালসা পূর্ণ ক্ষুব্ধ শার্দ্দুলের চাহনী। অশ্বপৃষ্ঠে ছুটে আসছে ভিলেন নায়িকার দিকে, নায়িকার পাশ কেটে চলে যাবার সময় এক ঝটকায় ভিলেন নায়িকাকে তুলে নিলো ঘোড়ার পিঠে। নায়িকার হাত থেকে ভরা কলসীটা পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেলো। নায়িকা তীব্র চীৎকার করে, উঠলো—বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও.......

অদূরে একটা ঘোড়ার পিঠে নায়ক ছুটে আসে, দাঁড়ায় একটু ঘোড়াটা দু'পা উঁচু করে চিঁহিঁ শব্দ করে তারপর তীর বেগে ছুটে যায়....

মেকআপ নেওয়া হয়ে গেলো।

নায়িকা কলসী কাঁখে এসে দাঁড়ালো পথের মধ্যে।

পরিচালক স্ক্রিপ্ট খুলে তার কার্যসূচী বুঝিয়ে দিলেন নায়িকা জ্যোছনা রায়কে।

ক্যামেরা নায়িকাকে ধরে এগুচ্ছে।

নায়িকা আপন মনে কলসী নিয়ে পথ বেয়ে চলেছে।

পরিচালক চীৎকার করে উঠলো—কাট্।

এদিকে অশ্বপৃষ্ঠে দ্রুত এগিয়ে আসছে ভিলেন। ক্যামেরা এবার অশ্বসহ ভিলেনকে ধরলো। ক্যামেরা ধীরে ধীরে ঘুরছে।

দ্রুত এগিয়ে আসছে ভিলেন।

পরিচালক নাহার চৌধুরীর কণ্ঠস্বর—কাট্।

আবার নায়িকাকে ধরলো ক্যামেরা, ছুটে আসছে ভিলেন অশ্বপৃষ্ঠে। ক্যামেরায় এক সঙ্গে ধরা হলো—ভিলেন নায়িকাকে এক ঝটকায় তুলে

নিলো অশ্বপৃষ্ঠে, তারপর অশ্বপৃষ্ঠে নায়িকা সহ ভিলেন ছুটে চলেছে। কলসীটা নায়িকার হাত থেকে খসে পড়ে খান খান হয়ে ভেংগে গেলো। এ দৃশ্যটাও ক্যামেরা ম্যান অনন্ত বাবু ধরে নিলেন একই সঙ্গে।

পরিচালক আনন্দধ্বনি করে উঠলেন—সাবাস!

এখন নায়ক অরুণ কুমারের কাজ।

অরুণ কুমার তার সাদা ধবধবে ঘোড়াটার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

ক্যামেরা ঠিক্ করে নিলেন অনন্ত বাবু।

পরিচালক অরুণ বাবুর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন স্ক্রিপ্ট হাতে।

অন্যান্য যার যা কাজ সবাই ঠিক্ হয়ে কাজ শুরু করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন।

শব্দযন্ত্রী কাওসার আহম্মদের এখন কোন কাজ নেই। তিনি ঘোড়ার খুঁড়ের শব্দ পরে সংযোগ করে নেবেন, এখন তিনি কাজ দেখে যাচ্ছেন শুধু।

অরুণ কুমারকে পরিচালক তার কাজ বুঝিয়ে দিতেই অরুণ বাবুর মুখ বিবর্ণ হলো, তাকে অনেক করে ঘোড়া চড়া শেখানো হয়েছিল, কিন্তু আজ বলছেন, "আমি এটা পারবো কিনা সন্দেহ"।

পরিচালক বিপদে পড়লেন; এমনটি যে হবে কল্পনাও করতে পারেন নি। তিনি ভেবেছিলেন, অরুণ কুমারকে যে ভাবে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়ে নেওয়া হলো তাতেই কাজ চলবে।

কিন্তু এখন একেবারে তিনি বেঁকে বসলেন, ঘোড়ায় চড়ে দৌড়তে পারবেন না।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন পরিচালক নাহার চৌধুরী।

স্টুডিওতে ছবির প্রাথমিক কাজ শেষ করে আউট্‌ডোরে সুটিং এ বেরিয়েছেন নাহার চৌধুরী। আউট্‌ডোরের কিছু দৃশ্য গ্রহণের পর ইনডোরে কাজ শুরু করবেন—এই তার ইচ্ছা। হিরোর দু'টো মাত্র দৃশ্য ইতিপূর্বে গ্রহণ করা হয়েছে। ঘোড়া চড়া দৃশ্যগুলি বাকী রেখে, তাকে ঘোড়া চড়া শেখানো হচ্ছিলো।

আজ পরিচালক নাহার চৌধুরী বিপদে পড়ে গেলেন। এ দৃশ্য এই স্থানেই গ্রহণ করতে হবে। বিস্তৃত বালুকাভূমি, মাঝ মাঝে টিলা আর ঝোপ জাড়, অদূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে।

পরিচালক অরুণ কুমার চেষ্টা নিতে বললেন।

তিনি ঘোড়ায় চড়লেন বেটে কিন্তু ঘোড়ার পিঠে এই উঁচু নীচু স্থান দিয়ে দৌড়াতে রাজি হলেন না, ভয়ে কুকড়ে গেলেন—যদি পড়ে গিয়ে মেরুদণ্ড ভেংগে যায়!

বেশ কিছুক্ষণ এ সব নিয়েই কেটে গেলো।

এবার উপায়? অন্ততঃপক্ষে ঘোড়ায় চড়া ব্যাপারটা আর একজনকে নিয়েও চালানো যায়, কিন্তু তাদের ইউনিটে কেউ ঘোড়ায় চাপতে জানেনা। পরিচালক এনিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

পরিচালক যখন উপায়ন্তর না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন তখন বনহুর এগিয়ে এলো—নায়ক ছাড়া যদি চলে তবে আমি একবার চেষ্টা নিতে পারি কি?

আনন্দে অস্ফুট ধ্বনি করে বনহুরকে জড়িয়ে ধরলেন পরিচালক নাহার চৌধুরী। খুশীতে যেন ফেটে পড়লেন বললেন—আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো।

হেসে বললো বনহুর—থাক আগে কাজ হোক।

দৃশ্যটা গ্রহণ করা হয়ে গেলো।

গোটা ইউনিট জয়ধ্বনি করে উঠলো।

বনহুরকে সামান্য মেকআপ দেওয়া হয়েছিলো—তাতেই তকে অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছিলো। তাছাড়া ঘোড়ায় চড়া কালে মুখ স্পষ্টভাবে দেখানো হয় নাই, কাজেই অসুবিধা হলোনা কিছু।

পরিচালক নাহার চৌধুরী জড়িয়ে ধরলেন বনহুরকে।

সুদক্ষ অভিনেতার মতই নাকি সে কাজ করেছে। বনহুরের প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। এতো অল্প সময়ে এতো সুন্দরভাবে কোন অভিজ্ঞ অভিনেতাও নাকি কাজ করতে পারেনা।

সেদিনের সুটিং শেষ করে আবার যাত্রা শুরু করলেন পরিচালক নাহার চৌধুরী।

কিন্তু সেদিনের পর হঠাৎ অরুণ কুমার বেঁকে বসলেন, এ ছবিতে তিনি আর কাজ করবেন না।

পরিচালক কথাটা শুনে আকাশ থেকে পড়লেন।

অনেক করেও অরুণ কুমারকে মত করানো গেলোনা।

সেদিনে বনহুরের কৃতিত্ব তার আত্মমর্যাদায় চরম আঘাত করেছিলো। একেই অরুন কুমার বনহুরের সৌন্দর্য দর্শনে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। চিত্রজগতে অরুন কুমার নাম-করা সুপুরুষ। শহরের বহু যুবতী অরুণ কুমারের সঙ্গে এতোটুকু আলাপ করার জন্য সদা উন্মুখ। সেই অরুণ কুমার সেনের এই চরম অপমান। তার সৌন্দর্য ম্লান হয়ে গেছে মকছুদ চৌধুরীর কাছে। নিজকে অপমানিত বোধ করে অরুণ কুমার।

অরুণ কুমার 'কুন্তিবাঈ' ছবির জন্য চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি অসম্ভবভাবে বেঁকে বসলেন।

পরিচালক নাহার চৌধুরী ভেংগে পড়বার লোক না। অরুণ কুমার তার ছবিতে কাজ না করলেও তিনি ছবি ছেড়ে পালাবেন না। 'কুন্তিবাঈ' ছবির প্রযোজক আরফান উল্লাহ্‌র দৃঢ় বিশ্বাস নাহার চৌধুরীর উপর। ভদ্রলোকের আরও তিনখানা ছবিতে নাহার চৌধুরী পরিচালনা করেছেন। প্রত্যেকটা ছবি তিনি আপ্রাণ চেষ্টা ও আন্তরিকতা নিয়ে সমাধা করেছিলেন। তিন খানাই হিট ছবি হয়েছিলো। প্রচুর পয়সা পেয়েছেন প্রযোজক আরফান উল্লাহ!

নাহার চৌধুরী প্রত্যেকটা ছবিতে নতুন মুখ আবিষ্কার করেন। প্রাণঢালা যত্নে তিনি এদের শিখিয়ে কার্যক্ষম করে গড়ে তোলেন। এহেন জন অরুণ কুমারের এই অহেতুক অভিমানে হতাশ হলেন না।

সেদিন বনহুর আর নূরী ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস দেখছিলো, আর মাঝে মাঝে বনহুর নূরীকে দু'একটা পূর্ব কথা বলে তার স্মরণশক্তি ফেরবার চেষ্টা করছিলো বনহুর যতই যা করুক, সব সময় নূরীর জন্য তার চিন্তার অন্ত নেই। নূরীর স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে না আসা অবধি নানাভাবে নানা কাজের মধ্যে দিয়ে ওকে পূর্ব কথা স্মরণ করাতে চেষ্টা করত সে। আজও এ-কথা সে-কথা বলে নূরীর জ্ঞান পরীক্ষা করছিলো।

এমন সময় পরিচালক নাহার চৌধুরী ও নায়িকা জ্যোছনা রায় এসে দাঁড়ালেন তাদের পাশে।

আকাশে পূর্ণ চন্দ্র।

জ্যোছনার আলোতে ডেকখানা আলোকিত।

নাহার চৌধুরী হেসে বললেন—আপনারা এখানে ; আর আমরা খুঁজে এলাম আপনাদের ক্যাবিনে।

হেসে বললো বনহুর—সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস দেখছিলাম।

সত্যি, প্রকৃতির অপরূপ লীলা—কিন্তু এ সব দেখবার বা উপভোগ করবার শক্তি ক'জনার আছে বলুন? সারা দিন থাকি ছবির চিন্তা নিয়ে। রাতে যে ঘুমোবো তারই কি যো আছে; পর দিনের প্রোগ্রাম ভাবতেই গোটা রাত কাবার হয়ে যায়। তারপর ফিরে তাকালেন নাহার চৌধুরী জ্যোছনা রায়ের দিকে—কি বলো জ্যোছনা, সত্যি কিনা?

জ্যোছনা রায় একটু হাসলো।

নাহার চৌধুরী এবার বললেন—মিঃ মকছুদ, আপনার সঙ্গে একটি জরুরী কথা আছে।

বেশ বলুন?

এখানে নয়, চলুন ক্যাবিনে সেখানেই বলবো।

ধন্যবাদ। চলুন। বনহুর এবার নূরীকে লক্ষ্য করে বললো—তুমি ক্যাবিনে যাও নূরী, আমি এক্ষুনি আসছি।

নূরী নীরবে তাদের নিজ ক্যাবিনের দিকে চলে গেলো।

বনহুর এগুলো নাহার চৌধুরী আর জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে।

পরিচালক নাহার চৌধুরীর ক্যাবিনে এসে তিন জন মুখো-মুখী বসলো। ক্যামেরা ম্যান অনন্ত বাবুও আছেন সেখানে।

অনন্ত বাবু বয়সী ভদ্রলোকে—ধীর গম্ভীর মানুষ। ক্যামেরায় তাঁর দক্ষতা অপরিসীম। অনন্ত বাবু নীরবে সিগারেট পান করছিলেন। ক্যাবিনে চতুর্থ জন অনন্ত বাবু ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।

নাহার চৌধুরী সিগারেট-কেসটা বাড়িয়ে ধরলেন বনহুরের দিকে—নিন।

বনহুর একটা সিগারেট তুলে নিলো আংগুল দিয়ে।

নাহার চৌধুরী নিজেও একটা সিগারেট নিয়ে গুঁজলেন ঠোঁটের ফাঁকে। তারপর অগ্নি সংযোগ করে এক মুখ ধোঁয়া ছুড়ে দিলেন সম্মুখে।

বনহুর আপন মনে সিগারেট থেকে ধূম্র নির্গত করছিলো। নাহার চৌধুরী তাকে এখানে কি কথা বলার জন্য ডেকে এনেছেন, এখনও সে জানে না।

বনহুর একবার নিজের অজ্ঞাতে তাকালো জ্যোছনা রায়ের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোছনা রায়ের দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো তার। জ্যোছনা রায় নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

বনহুরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই জ্যোছনা রায় দৃষ্টি নত করে নিলো।

নাহার চৌধুরী বললেন—মিঃ মকছুদ, আপনাকে যে কথা বলবো বলে এখানে ডেকেছি—সত্যি তা বলতে আমি কুণ্ঠা বোধ করছি, কাজেই আমাকে কিছুটা ভূমিকা গ্রহণ করতে হচ্ছে।

বলুন? হেসে বললো বনহুর।

নাহার চৌধুরীর হাতের সিগারেটে বেশ জোরে কয়েকটা টান দিয়ে এ্যাসট্রেতে সিগারেটটা নিক্ষেপ করে সোজা হয়ে বসলেন।

বনহুর ও অন্যান্য সবাই তাকালো নাহার চৌধুরীর মুখের দিকে।

নাহার চৌধুরী বললেন এবার—আপনি শুনেছেন এবং জানেন আমার 'কুন্তিবাঈ' ছবির নায়ক অরুণ কুমার সেন। অরুণ কুমারকে আমি এ ছবির জন্য পঁচিশ হাজার টাকা কনট্রাক্ করেছি। কিন্তু অরুণ কুমার এখন বেঁকে বসেছেন—এ ছবিতে তিনি কাজ করবেন না।

বনহুর কিছুমাত্র আশ্চর্য হলোনা, কারণ এ কথা সে পূর্বেই শুনেছিলো। নিশ্চুপ ধুম্র নির্গত করে চললো সে। দৃষ্টি তার ক্যাবিনের ছাদে সীমাবদ্ধ। সোফায় ঠেস দিয়ে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে নাহার চৌধুরীর কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলো বনহুর।

নাহার চৌধুরী বলে যাচ্ছেন—অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাকে রাজি করাতে সক্ষম হলাম না। এখন আমি বিপদগ্রস্ত।

বনহুর এবার শান্ত কণ্ঠে বললো—চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা সত্ত্বেও তিনি কি করে মত পাল্টান?

কি করবো বলুন, সব ওদের ইচ্ছা।

না, এ হতে পারে না, তাকে বাধ্য করতে হবে ছবি ব্যাপারে।

কিন্তু তা হয় না মিঃ মকছুদ, জোর করে কাউকে দিয়ে অভিনয় আদায় করানো যায় না।

বনহুর সোজা হয়ে বসলো, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো সে—আপনি এতো সোজায় তাকে ছাড়বেন কেনো? শুনেছি ছবির কয়েকটা দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে অরুণ বাবু আছেন।

হাঁ, কিন্তু মাত্র দু'টি দৃশ্যে অরুণ বাবু কাজ করেছেন। এখন সে সরে পড়েলেও আমাদের তেমন কোন ক্ষতি হবেনা।

তাহলে অন্য কোন নায়ক....

বনহুরের মুখের কথা লুফে নিলেন নাহার চৌধুরী—হাঁ, আমি সেই কথাই ভাবছি মিঃ মকছুদ এবং সেই চিন্তাই করছি। আগামীকাল আমাদের জাহাজ বসুন্দায় পৌছে যাবে। আজ জাহাজে আমাদের শেষ দিন, তাই ভাবছি আপনাকে একটা কথা বলবো............

থামলেন নাহার চৌধুরী।

বনহুর তার কথা শুরু করবার পূর্বেই জানতে পেরেছে—তাকে কি বলবেন বা বলবার জন্য নাহার চৌধুরী এখানে ডেকে এনেছেন। মনে মনে হাসলো বনহুর আজ যদি তার আসল পরিচয় জানতো, তাহলে.....

বনহুরের চিন্তাধারায় বাধা পড়লো, বললেন নাহার চৌধুরী —বসুন্দায় পৌছেই আমার ছবির কাজ শুরু হবে। নায়ক-নায়িকা উভয়ের কাজ একাধারে চলবে। নাহার চৌধুরী রুমাল বের করে নিজের মুখখানা একবার মুছে নিলেন, তারপর ঢোক গিলে একটু কেশে বললেন—আমার ইচ্ছা, আপনি যদি আমাদের 'কুন্তিবাঈ' ছবির..... মানে......নায়ক হিসাবে কাজ করেন......

বনহুর মিছামিছি বিস্ময় টেনে বললো—এ আপনি কি বলছেন মিঃ নাহার? অসম্ভব এটা।

না, অসম্ভব নয়। এতোক্ষণে নাহার চৌধুরী নিজের কণ্ঠে জোর পেলেন যেন। যা বলতে গিয়ে এতোখানি ভুমিকা টানলেন, এতোক্ষণে যেন সব স্বচ্ছ হয়ে গেছে। একটু থেমে বললেন—আপনার কাছে আমার অনুরোধ মিঃ মকছুদ। হাতজুড়ে কথাটা বললেন তিনি।

বনহুর দস্যু হলেও তার মানুষের প্রাণ, তাছাড়াও আজ নাহার চৌধুরী ছাড়া তার জীবন রক্ষা পেতোনা। শুধু তার নয়—নূরীও না খেয়ে শুকিয়ে মরতো ঐ নির্জন সাগর সৈকতে। এতোখানি উপকার যে করেছে তাকে কি করে বনহুর বিফল করবে। কিন্তু কত দিন দেখে নাই তার মাকে, মনিরাকে....... ওদের জন্য মনটা ছট্ ফট্ করে উঠলো, আনমনা হয়ে গেলো বনহুর।

নাহার চৌধুরী অনুনয়ের সুরে বললো—আপনি আমাকে বাঁচান মিঃ মকছুদ।

বনহুর সম্বিৎ ফিরে পেলো, বললেন—আমি তো অভিনয় জানিনা।

বনহুরের কথায় নাহার চৌধুরীর দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বনহুরের নরম সুরে তিনি যেন ভরসা পেলেন খুঁজে। আনন্দ ভরা কণ্ঠে বললেন—আপনি শুধু রাজি হলে আমরা কৃতার্থ। অভিনয় আপনাকে জানতে হবেনা, যা করতে হয় আমি সব শিখিয়ে নেবো!

বেশ রাজি।

নাহার চৌধুরী আর একবার বনহুরকে জড়িয়ে ধরলেন আনন্দের আতিশয্যে।

অনন্ত বাবুর চোখমুখেও খুশীর উচ্ছ্বাস, তিনি এতোক্ষণ গম্ভীর মুখে প্রতীক্ষা করছিলেন মিঃ মকসুদ রাজি হন কি না। অনন্ত বাবুই নাহার চৌধুরীকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, অরুণ বাবু কাজ করতে চান না বেশ ভাল কথা। দেখুন যদি মিঃ মকছুদ সাহেবকে রাজি করাতে পারেন.....

বাস্—কথাটা নাহার চৌধুরীর মনে লেগে গিয়েছিলো। তিনিও অন্তরে অন্তরে এমনি চিন্তাই করছিলেন, কিন্তু প্রকাশ করতে পারেননি। অনন্ত বাবু কথাটা বলায় তার মনে একটা উদ্যম বাসনা ছাড়া নিয়ে উঠেছিলো, তিনি খুশী হয়েছিলেন খুব। এবং কথাটা ছবির নায়িকা জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে আলাপ করে আরও আনন্দিত হয়েছিলেন।

জ্যোছনা রায় বলেছিলো—অরুণ কুমার বাবু যদি কাজ না করতে চান তবে তাকে দিয়ে জোর করে কাজ আদায় করা যাবে না। এতে ছবি হতে পারে কিন্তু ছবির মধ্যে কোন আন্তরিকতা থাকবে না। শেষ পর্যন্ত ছবি হিট্ না-ও করতে পারে। মিঃ মকছুদ সাহেব যদি রাজি হন তবে কোন কথা নেই।

নাহার চৌধুরীর মন খুশীতে ভরে উঠেছিলো। তিনি জ্যোছনা রায় সহ তাই মিঃ মকছুদের পাশে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

বনহুর রাজি হওয়ায় জ্যোছনা রায়ের মুখমণ্ডল দীপ্তময় হয়ে উঠলো।

বনহুর ওর দিকে চাইতে হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালো জ্যোছনা রায়।

❑

বৈকালে নির্জন শান্ত পরিবেশে ডেকে দাঁড়িয়েছিলো বনহুর। ফুরফুরে হওয়ায় বনহুরের কোঁকড়ানো চুলগুলি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিলো। বনহুর বারবার হাত দিয়ে চুলগুলি পিছনে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলো। দক্ষিণ হস্তে ধুমায়িত সিগারেট।

জ্যোছনা রায় এসে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে—হ্যালো মিঃ মকছুদ।

ফিরে তাকালো বনহুর, স্মিত হাসি হেসে বললো—আসুন।

জ্যোছনা রায় এক থোকা রজনী গন্ধার মত বনহুরের পাশে এসে দাঁড়ালো. সুমধুর কন্ঠস্বরে বললো—আপনার বোন কোথায়?

বললো বনহুর—ক্যাবিনে।

এই সুন্দর বৈকালে ক্যাবিনের অন্ধকারে? আশ্চর্য মেয়ে সত্যি আপনার বোনটা। কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান না।

হাঁ, আগে ঠিক্ অমন ছিলোনা, জাহাজডুবির পর থেকে ওর কি যেন হয়েছে—কারো সঙ্গে মিশতে বা কথা বলতে চায় না। এমন কি আমার সঙ্গেও ঠিকভাবে কথাবার্তা বলে না।

জ্যোছনা রায় বললো—সত্যি বড় দুঃখের কথা! নিশ্চয়ই ব্রেনে কোন গোলযোগ হয়েছে।

হাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

ওকে ঠিক্‌ভাবে চিকিৎসা করা দরকার।

শহরে পৌঁছে ওর চিকিৎসা ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে।

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরবে কাটে।

জ্যোছনা রায়ের দেহে আজ ফিকে গোলাপী শাড়ী! ব্লাউজটাও ঠিক শাড়ীর রঙ—ফিকে গোলাপী। একরাশ কালো কোঁকড়ানো চুল মাথায় উপরে চূড়ো করে বাধা। একটা গোলাপ ফুল গোঁজা রয়েছে চূড়োর বাম পাশে। ফুলটা অবশ্য সত্যি গোলাপ নয়, প্লাষ্টিকের ফুল। কিন্তু দেখলে কেউ ভাবতে পারবে না ওটা নকল ফুল। একেবারে যেন সদ্য গাছ থেকে তুলে আনা গোলাপ ওটা। পায়ের জুতোও গোলাপী, ভ্যানিটি ও রুমালখানাও সে শাড়ীর সঙ্গে ম্যাচ করে পরেছে। তার দুধে আলতা মেশানো দেহটার সঙ্গে মিশে গেছে যেন এসব। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে জ্যোছনা রায়কে আজ।

অভিনেত্রী জ্যোছনা রায় শুধু সুন্দরীই নয়। তার মিষ্টি হাসিটুকু দর্শকগণকে উন্মাদ করে তোলে। জ্যোছনা রায় যে ছবিতে থাকে সে ছবি

হিট্ না করে যায় না। সমস্ত দেশজোড়া নাম জ্যোছনা রায়ের। জ্যোছনা রায়কে না দেখলে দর্শকমণ্ডলীর প্রাণই যেন ভরে না।

সেই সুন্দরী অভিনেত্রী জ্যোছনা রায় এসে দাঁড়িয়েছে বনহুরের পাশে। সেন্টের একটা সুমিষ্ট গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চার ধারে। সদ্য ফোটা গোলাপ ফুলের সুবাসের মত। বনহুর চট্ করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না। তাকিয়ে রইলো নির্নিমেষ নয়নে।

মৃদু হেসে বললো জ্যোছনা রায়—কি দেখছেন?

অপূর্ব।

কি?

আপনি।

বনহুরের মুখে এই কথাটা শুনবার জন্যই যেন জ্যোছনা উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতিক্ষা করছিলো। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো যে সে। দৃষ্টি নত করে নিয়ে বললো জ্যোছনা রায়— বেশী বাড়িয়ে বলছেন।

মোটেই না। মিস রায়, সত্যি আপনি অপূর্ব।

যাক্ ওসব বাজে কথা।

এটা যদি বাজে কথা হয় তবে কোন্টা কাজের কথা, বলুন?

সত্যি, আপনি আমার বিপরীতে কাজ করবেন জেনে অনেক খুশী হয়েছি। ধন্যবাদ জানাতে এলাম আপনাকে।

ও ঃ এই কথা? হাঁ, আপনার ধন্যবাদটুকু, এখনও পাইনি। কিন্তু এখন তো আপনারা খুব ধন্যবাদ দিচ্ছেন, যখন দেখবেন ক্যামেরার সম্মুখে দাঁড়িয়ে একেবারে সব গোল পাকিয়ে দেবো তখন হবে মজা। কথা শেষ করে হেসে উঠলো বনহুর।

জ্যোছনা রায় বনহুরের হাস্য উজ্জ্বল দীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো নিষ্পলক নয়নে।

❑

বসুন্দায় পৌঁছে নাহার চৌধুরী কিছুতেই বনহুরকে ছেড়ে দিলেন না। 'কুন্তিবাঈ' ছবির প্রযোজক জনাব আরফান উল্লাহ সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে সব কথা খুলে বললেন।

বনহুরের অপরূপ সৌন্দর্য আর মধুর ব্যবহার তাঁকে মুগ্ধ করলো, তিনি খুশী হলেন এ ব্যাপারে। অরুণ কুমারকে যে টাকায় তিনি চুক্তিবদ্ধ

করেছিলেন তার ডবল টাকা দেবেন তিনি কথা দিলেন এবং সেইভাবে চুক্তিপত্র করা হলো।

নাহার চৌধুরীর শীঘ্রই ছবির কাজ শুরু করবেন জানালেন।

অরুণ কুমারের দৃশ্যগুলি পুনরায় নেবার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

বনহুরের জন্য একটি বাড়ী ছেড়ে দিলেন প্রযোজক আরফান সাহেব। বসুন্দা শহরে তার বেশ বড় বড় কয়েকটা বাড়ী ছিলো, কাজেই কোন অসুবিধা হলো না।

বনহুর অবশ্য বলেছিলো—নূরীকে রেখে ফিরে আসবে, কিন্তু নাহার চৌধুরী কিছুতেই রাজী হন নাই। ছবির কাজ শেষ করে তবেই তাকে ছাড়া হবে বলেছেন তিনি। কথাটা অবশ্য তার সঙ্গে আপোষেই হয়েছে।

অগত্যা বনহুর নূরীকে নিয়ে আরফান উল্লার দেওয়া বাড়ী খানাতেই উঠলো।

সুন্দর আধুনিক প্যাটার্নে তৈরী মস্ত বাড়ী।

শহরের ঠিক দক্ষিণ দিকে এগিয়ে নদীতীরে বাড়ীখানা। সম্মুখে মস্ত ফুলের বাগান গাছ কেটে দু'টো কাঁকর বিছানো পথ এগিয়ে গেছে গাড়ী-বারান্দার দিকে। গাড়ী-বারান্দার পরই মস্তবড় হলঘর। তারপর টানা-বারান্দা চলে গেছে অন্তপুরের দিকে। একতলা হলেও অতি সুন্দর মনোরম বাড়ীখানা।

প্রত্যেকটা ঘরে মূল্যবান আসবাবপত্র দিয়ে আধুনিক কায়দায় সাজানো। প্রত্যেকটা কক্ষের মেঝেতেই দামী কার্পেট বিছানো রুচী অনুযায়ী আসবাব-পত্র রয়েছে প্রতিটি কামরায়।

হলঘরের পাশের বড় কামরাটা বনহুর নিজের জন্য বেছে নিলো। নূরী থাকবে পরের কামরায়। এ কক্ষের মধ্য দিয়ে একটা দরজা আছে। কাজেই নূরীকে দেখা-শোনার কোন অসুবিধা হবে না।

বনহুর নিজের জন্য যে কক্ষ বেছে নিলো সেটা অন্যান্য কক্ষের চেয়ে একটু বড়। কক্ষের দেয়াল ফিকে সবুজ রং করা। মেঝেতে পুরু গালিচা পাতা, সেটাও ফিকে সবুজ। দরজা-জানালায় ভেলভেটের ফিকে সবুজ পর্দা। এমন কি কক্ষের ইলেট্রিক ল্যাম্পটাও সবুজ রঙ এর। একপাশে মেহগনি কাঠের তৈরী আধুনিক খাট। খাটে পঞ্জের গদি আটা সুন্দর বিছানা। ফিকে সবুজ বিছানার কভার। বালিশের আবরণটাও ফিকে সবুজ। বনহুরের বেশ লাগলো কক্ষটা। খাটের পাশে ছোট্ট টেবিল। টেবিলে ফুলদানী, কিন্তু ফুল নেই।

কক্ষটা বনহুরের খুব পছন্দ হলো।

প্রযোজক সাহেব বনহুরের দিকে তাকিয়ে বললেন—পছন্দ হলো?

বনহুর খুশীভরা কণ্ঠে জবাব দিলো—অপূর্ব।

কথাটা বলেই বনহুর ফিরে তাকালো পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জ্যোছনা রায়ের মুখের দিকে।

পরিচালক নাহার চৌধুরী ও জ্যোছনা রায় বনহুরের সঙ্গেই এসেছিলো তাকে তার নতুন বাড়ীতে পৌঁছে দিতে।

বনহুর হেসে বললো—মিস রায়, সেদিন জাহাজে আপনার প্রসাধনীর মতই কক্ষটা অপূর্ব নয় কি? সত্যি আমি মুগ্ধ হয়েছি, আরফান সাহেব ও আপনার রুচির পরিচয় পেয়ে।

আরফান সাহেব বিপুল ভুরি দুলিয়ে হাসলেন, তারপর বললেন—আমার একমাত্র কন্যা আতিয়ার জন্য বাড়ীটা আমি তৈরী করেছি।

বনহুর বললো—আতিয়া!

হাঁ, মিঃ মকছুদ, আমার বড় আদরের মেয়ে আতিয়া।

সেদিন আর বেশী কথাবার্তা হলো না।

বিদায় নিয়ে চলে গেলেন আরফান উল্লাহ, নাহার চৌধুরী ও জ্যোছনা রায়।

বনহুর ঘুরে ফিরে বাড়ীটা দেখতে লাগলো।

বাড়ীতে একজন দারওয়ান দু'জন চাকর। একজন মালি। একজন বাবুর্চি ও একজন বয়।

চাকরদের মধ্যে একজন বেশ বয়স্ক, তার নাম ইয়াসিন মিয়া। সেই বনহুরের সঙ্গে ঘুরে ফিরে সব দেখাতে লাগলো।

ইয়াসিনের ব্যবহারে অল্প সময়ে বনহুর সন্তুষ্ট হলো।

দারওয়ান বলিষ্ঠ জোয়ান লোক, নাম বাহাদুর খাঁ।

অন্য চাকরটির নাম রানু। একেবারে যেন আস্ত গরু আর কি। একটা বললে আর একটা করে বসে। তবু ওকে রাখা হয় বিশ্বাসী বলে।

বয়টা বয়ই বটে। ছোট বেটে-খাটো যেন সাত বছরের বালক। কিন্তু আসলে বিশ বছরের কম নয় তার বয়স।

মালি সব সময় বাগান নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অর্দ্ধবয়সী— বেশ কাজের লোক বলে মনে হলো বনহুরের।

বনহুর সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে নিলো নিজে গায়ে পড়ে।

কিন্তু একটা অবাক কাণ্ড লক্ষ্য করলো বনহুর—সবাই যেন তার দিকে কেমন একটা প্রশ্নভরা চোখে তাকাচ্ছে। কি যেন বলতে চায় কিন্তু বলতে পারছে না।

যাক, অতো ভেবে দেখবার সময় এখন বনহুরের নেই, সে মোটামুটি সমস্ত বাড়ীখানা একবার ঘুরে ফিরে দেখে নিয়ে ফিরে এলো নিজের কক্ষে।

নূরী কোথায় গেলো।

বনহুর নূরীর কক্ষে উঁকি দিতেই দেখলো— সে মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে আছে। অবশ্য মেজেতে দামী কার্পেট পাতা আছে। একপাশে খাট, খাটে বিছানা পাতা। অথচ নূরী মেঝেতে শুয়ে আছে কেনো!

বনহুর এসে দাঁড়ালো তার পাশে—নূরী।

চোখ মেলে তাকালো নূরী।

বনহুর বললো—বিছনায় না শুয়ে মেঝেতে কেনো শুয়েছো?

নূরী নীরবে উঠে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

বনহুর এসে বসলো ওর পাশে, ধীরে ধীরে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে ডাকলো—নূরী, একি হয়ে গেছো তুমি? কথা বলো নূরী।

নূরী নীরব আঁখি মেলে তাকিয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে।

বনহুরের গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

উঠে দাঁড়ায় বনহুর, ফিরে যায় নিজের ঘরে।

বয় এসে জানায়—স্যার, খাবার দেওয়া হয়েছে।

বনহুর ডাকে—এসো নূরী।

নূরীর কোন সাড়া নেই।

বনহুর পুনরায় নূরীর কক্ষে প্রবেশ করে।

পাশে এগুতেই দেখতে পায়—নূরীর দু'চোখে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

বনহুর গভীর আবেগে ওকে টেনে নেয় বুকে।

চিবুকটা উঁচু করে ধরে বলে বনহুর—নূরী, মায়াচক্র ভেদ করে তোমাকে উদ্ধার করে আনলাম, কিন্তু তুমি আমাকে চিনতে পারলে না।